ISU TEXTILE CLUB
PRESENTS

Spandex

AN EXPLORATION BEYOND DISCIPLINES

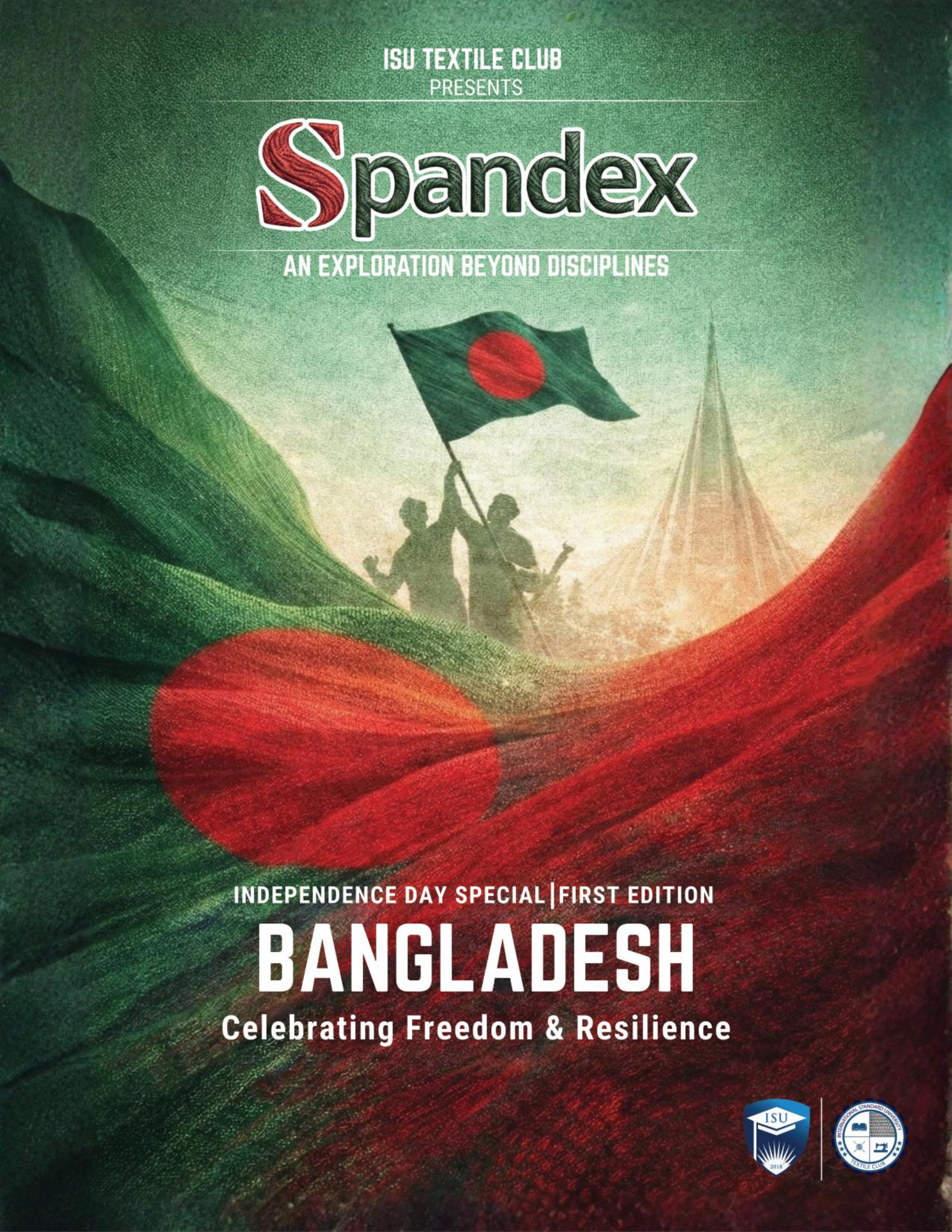

INDEPENDENCE DAY SPECIAL | FIRST EDITION

BANGLADESH

Celebrating Freedom & Resilience

ISU TEXTILE CLUB

PRESENTS

Spandex

AN EXPLORATION BEYOND DISCIPLINES

INDEPENDENCE DAY SPECIAL

FIRST EDITION

ISU TEXTILE CLUB

উপাচার্য মহোদয়ের বানী

ISU Textile Club"-এর প্রকাশিত ম্যাগাজিন "Spandex" আমাদের শিক্ষার্থীদের চিন্তার গভীরতা ও সৃজনশীলতার একটি অনন্য প্রতিচ্ছবি। এ ধরনের উদ্যোগ কেবল প্রকাশনা নয়, বরং এটি উপলব্ধি, দায়বদ্ধতা ও মানবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

আমি প্রায়ই বলি, মানুষের জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেক্সটাইলে আবৃত। জন্মের মুহূর্তে শিশুকে যে তোয়ালে বা কাপড়ে জড়িয়ে ধরা হয়, সেটিও টেক্সটাইল; আবার জীবনের শেষ অধ্যায়ে শেষ বিদায়ে মানুষকে যে কাপড়ে আচ্ছাদিত করা হয়, সেটিও টেক্সটাইল। অর্থাৎ টেক্সটাইল মানবজীবনের এমন এক বন্ধু, যা জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।এই কারণেই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শুধুমাত্র একটি বিষয় নয়, এটি মানবসভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি শিল্প। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

"Spandex" ভবিষ্যৎ টেক্সটাইল প্রকৌশলীদের চিন্তা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধকে সমৃদ্ধ করবে, এই প্রত্যাশা রাখি। এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ISU Textile Club-এর সকল সদস্য ও সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

"Spandex" এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

ড. প্রফেসর আব্দুল আউয়াল খান
ভাইস চ্যান্সেলর
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি

শ্রদ্ধেয় ডিন (ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি) এর বানী

ISU Textile Club-এর ম্যাগাজিন "Spandex" একটি প্রশংসনীয় একাডেমিক উদ্যোগ। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের জ্ঞানকে বাস্তব চিন্তা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এ ধরনের প্রকাশনা অত্যন্ত কার্যকর।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র, যেখানে উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন এবং শিল্প-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অপরিহার্য। Spandex ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও মত প্রকাশের সুযোগ করে দেবে।

এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি এই ম্যাগাজিন ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী তৈরিতে একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

ম্যাগাজিনটির ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মো আবুল কাশেম
বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিন, ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি

সম্মানীত রেজিস্ট্রার এর বানী

আমি আনন্দিত ও পুলকিত ।

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি এর ISU Textile Club ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা শানিত করার মানসে "Spandex" ম্যাগাজিন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের এক সুতোয় গেঁথেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই ম্যাগাজিনে তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো সৃজনশীলতা কথামালা আকারে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। একাডেমিক কার্যক্রম এর পাশাপাশি এই অসামান্য উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছা শক্তি, কাজের গতি, সময়জ্ঞান, টিম ওয়ার্ক, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি করবে। Spandex-এ আত্মপ্রকাশ ঘটবে তারুণ্যের প্রতিভার, যা ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ার এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ISU সামগ্রিক একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কে অগ্রগামি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে ।

আমি এই "প্রয়াসের" সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ।

মোঃ ফাইজুল্লাহ কৌশিক
রেজিস্ট্রার
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি

মাননীয় ট্রেজারার এর বানী

ISU Textile Club-এর প্রকাশিত ম্যাগাজিন "Spandex" একটি দায়িত্বশীল পরিকল্পনা ও দলগত প্রচেষ্টার ফলাফল। এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল সৃজনশীলতার পরিচয়ই দেয়নি, বরং সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করছে।

এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আশা করি Spandex এর প্রতিটি পদক্ষেপ হবে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সৃজনশীলতা এবং ISU Textile Club কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রয়াস।

আমি ম্যাগাজিনটির ধারাবাহিক উন্নতি কামনা করছি।

প্রফেসর ড. এইচ. টি. এম. কাদের নেওয়াজ
ট্রেজারার
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিট

শ্রদ্ধেয় মডারেটর এর বানী

সৃজনশীলতার নতুন দিগন্তে আপনাদের স্বাগতম!

মলাটবদ্ধ একগুচ্ছ পৃষ্ঠার নামই কেবল ম্যাগাজিন নয়; এটি হলো সময়ের প্রতিফলন, চিন্তার বহিঃপ্রকাশ আর ভবিষ্যতের দলিল। আজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের বুননে তৈরী 'SPANDEX' এর প্রথম সংস্করণ। নামের সার্থকতা বজায় রেখে এই ম্যাগাজিনটিও হয়ে উঠেছে স্থিতিস্থাপক, যেখানে টেক্সটাইলের রঙিন দুনিয়া আর সাহিত্যের সৃজনশীলতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমাদের এবারের আয়োজনের মূলে রয়েছে 'স্বাধীনতা'। সেই অমর স্বাধীনতা, যা আমাদের কথা বলতে শেখায়, ভাবতে শেখায় এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই এবারের সংখ্যায় আমরা গুরুত্ব দিয়েছি মহান মুক্তিযুদ্ধে টেক্সটাইল শিল্পের অজানা ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালীন ফ্যাশন এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাবনার জয়গানকে।

'SPANDEX' কেবল একটি বিভাগীয় ম্যাগাজিন নয়, এটি ISU Textile Club এর সেই অদম্য তরুণদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, যারা প্রচলিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে জানে। এখানে যেমন আছে গভীর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ, তেমনি আছে প্রাণের উচ্ছ্বাসে লেখা কবিতা, গল্প আর সমকালীন বাস্তবতার রসদ নিয়ে তৈরি ক্যারিকেচার।

এই ম্যাগাজিনটি সার্থক হয়ে উঠবে তখনই, যখন এর প্রতিটি পাতা আপনাদের ভাবনার খোরাক জোগাবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের এই নিরলস পরিশ্রম আর নিষ্ঠার ফসল আপনাদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক আমাদের পথচলা, সৃজনশীলতার এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

সবাইকে 'SPANDEX' পাঠের আমন্ত্রণ।

মো. হাসিবুল হাসান
মডারেটর
আইএসইউ টেক্সটাইল ক্লাব

সূচিপত্র

১.	স্বাধীনতা, মুক্তভাবে ভাবা, বাঁচা আর অনুভব করা	৩
২.	ফাস্ট ফ্যাশন: একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে পরিবেশের হিসাব	৪
৩.	টেক্সটাইল এর ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ	৫
৪.	অন্ধ ইউক্যালিপটাস	৬
৫.	সুতোর ভাষায় বোনা ঐতিহ্য: জামদানির আত্মকথা	৭
৬.	বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড: স্টাইল, আধুনিকতা ও স্বকীয়তার মেলবন্ধন	৮
৭.	নিউ নর্মাল; এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই	৯
৮.	Functional Textiles with Smart Properties: Green Approaches & Sustainable Applications	১১
৯.	চিত্রঃ সুতোয় বাধা স্বপ্ন	১৫
১০.	Healthcare & Hygiene Textiles for Medical Staff: Comfort, Safety and Efficiency	১৬
১১.	শেষ বিকেলের আলো	১৮
১২.	প্রিয়দর্শিনী	১৯
১৩.	টেক্সটাইল শিল্প: শুরু থেকে আধুনিক প্রযুক্তির যাত্রা	২০
১৪.	কেউ কেউ ফেরে	২২
১৫.	গ্রিন ইজ দ্য নিউ ব্ল্যাক: বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের সবুজ বিপ্লব	২৩
১৬.	আগন্তুক	২৪
১৭.	Bangladesh Textile Industry: From Fiber to Fashion; The Role of Engineering and Merchandising Excellence	২৫
১৮.	বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড: সময় ও স্বাচ্ছন্দ্যের বন্ধন	২৭
১৯.	এক ছাতার নিচে পুরো ঢাকা	২৮
২০.	সীমান্ত পেরিয়ে দার্জিলিং: এক বাংলাদেশি পথিকের দিনলিপি	২৯
২১.	নীরব কক্ষের মানুষ	৩০
২২.	স্বাধীন চিন্তায় বোনা এক শিক্ষাজীবন	৩১
২৩.	অনিবার্য বিজয়	৩২
২৪.	চিত্রঃ অনির্বাণ বাংলাদেশ	৩৩
২৫.	Made in Bangladesh: একটি ট্যাগের আড়ালে আমাদের হৃদস্পন্দন	৩৪
২৬.	আমি যেভাবে ফ্যাশন দেখি: একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থীর চোখে ইন্ডাস্ট্রি	৩৫
২৭.	চিত্রঃ তাঁতের টানে স্বপ্ন বোনা	৩৬
২৮.	নীরব প্রার্থনা	৩৭
২৯.	তাঁত এবং সুতা	৩৭
৩০.	কলোনিয়াল লুম থেকে জাতীয় কারখানা: শিকল ভাঙার বুনন	৩৮
৩১.	সুতোয় বোনা গল্প: ফ্যাশন থেকে ফিউচার	৩৯
৩২.	মানব জীবন ও আফসোস	৪০

৩৩.	অদৃশ্য অস্তিত্ব	৪১
৩৪.	সূতোর বাঁধনে স্বপ্নের বুনন	৪২
৩৫.	বিদ্রোহ	৪২
৩৬.	Dyeing with Bubbles?	৪৩
৩৭.	এখন জুলাই!	৪৪
৩৮.	চিত্রঃ অস্তমিত সবুজ	৪৫
৩৯.	কবিতা: ক্ষমতা, নিপীড়ন ও জাগরণের কণ্ঠ	৪৬
৪০.	মৌসুমি সখ্য: মোটিভ ৭৮৬	৪৬
৪১.	তাঁতের ছন্দে দিনযাপন	৪৭
৪২.	Textile Blunders - Mistakes That Cost Millions	৪৮
৪৩.	ফ্যাশন ও শিল্পখাতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভূমিকা	৫০
৪৪.	আমি হাদি বলছি	৫১
৪৫.	কাপড় রঙিন, জীবন কেন সাদা-কালো?	৫২
৪৬.	মুক্তিযুদ্ধ ও টেক্সটাইল: স্বাধীনতার বুননে এক গৌরবগাথা	৫৩
৪৭.	শেষ ট্রেন	৫৪
৪৮.	জামদানি শাড়ির ইতিহাস ও ঐতিহ্য	৫৫
৪৯.	তাঁত থেকে আধুনিক মিল: বাংলাদেশের বস্ত্রের গল্প	৫৬
৫০.	Female Textile Students	৫৭
৫১.	Textile Engineering: The Backbone of Bangladesh Economy	৫৮
৫২.	THREAD OF INDEPENDENCE	৫৯
৫৩.	আমার ভাবনায় টেক্সটাইল	৬০
৫৪.	উদ্ভিদবিহীন সেলুলোজ ফাইবারের গল্প!	৬১
৫৫.	থ্রিডি গার্মেন্ট সিমুলেশন: সুঁই-সুতার যুগ থেকে ডিজিটাল বিপ্লবে	৬২
৫৬.	চিত্রঃ গ্যালাক্সির মাঝে এক মুঠো জীবন	৬৩
৫৭.	শেখার প্রতিটি মুহূর্ত	৬৪
৫৮.	চিঠি	৬৫
৫৯.	তরঙ্গ	৬৭

স্বাধীনতা, মুক্তভাবে ভাবা, বাঁচা আর অনুভব করা

(ইজানা আক্তার মিম, ব্যাচ ৮, DTE)

'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে পতাকা, আন্দোলন, অথবা রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু স্বাধীনতা কি কেবল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না কি এর আরও গভীর, আরও ব্যক্তিগত একটি অর্থ আছে, যেখানে মানুষ নিজের চিন্তা, জীবনযাপন ও অনুভবের ওপর সত্যিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে?

'মুক্তভাবে ভাবা' স্বাধীনতার প্রথম ও মৌলিক শর্ত। ভাবনার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে মানুষ ধীরে ধীরে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সমাজ, পরিবার কিংবা সংস্কৃতির অদৃশ্য শাসন অনেক সময় আমাদের কী ভাবা উচিত আর কী ভাবা অনুচিত—তা নির্ধারণ করে দেয়। এর ফলে মানুষ প্রশ্ন করতে ভয় পায়, ভিন্নমত প্রকাশে সংকুচিত হয়। অথচ মুক্ত চিন্তাই মানুষকে সৃজনশীল করে, নতুন পথের সন্ধান দেয় এবং আত্মপরিচয়ের দিকে এগিয়ে নেয়। যে মানুষ ভাবতেই পারে না, সে কখনোই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে না।

ভাবনার পর আসে বাঁচার প্রশ্ন। বাঁচা শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নাম নয়; বাঁচা মানে নিজের মতো করে জীবনযাপন করা। John Locke বলেছিলেন, মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন, তার আছে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। রাষ্ট্র এসেছে এই অধিকার রক্ষার জন্য, কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি রাষ্ট্রই ঠিক করে দেয় আমরা কী ভাবব, কী বলব, কী বিশ্বাস করব, তবে সেই রাষ্ট্র কি আর রক্ষক থাকে? নাকি সে-ই হয়ে ওঠে সবচেয়ে সুক্ষ্ম কারাগার? Locke-এর স্বাধীনতা ছিল যুক্তির স্বাধীনতা। কিন্তু যুক্তি যদি ভয় পায়, তবে স্বাধীনতাও পঙ্গু হয়ে যায়।

Social Chain বা সমাজের অদৃশ্য শেকল আসলে কি? সমাজ কখনো লোহার শেকল পরায় না। সে দেয় পরিচয়—"তুমি ছেলে", "তুমি মেয়ে", "তুমি এটা পারো", "ওটা পারো না"। এই social chain সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ মানুষ একসময় নিজেই নিজেকে বেঁধে ফেলে সমাজের চাপে, হীনম্মণ্যতা, আর অস্তিত্বসংকটের কবলে পড়ে। মানুষ জন্মায় শূন্য হাতে, কিন্তু শূন্য মনে নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘিরে ধরে নিয়ম, বিশ্বাস, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, এক অদৃশ্য সমাজ। এই সমাজের ভেতরেই মানুষ স্বাধীনতা খোঁজে, আবার সেই সমাজই তাকে বেঁধে ফেলে। সমাজ, পরিবার কিংবা সংস্কৃতির অদৃশ্য শাসন অনেক সময় আমাদের কী ভাবা উচিত আর কী ভাবা অনুচিত—তা নির্ধারণ করে দেয়। এর ফলে মানুষ প্রশ্ন করতে ভয় পায়, ভিন্নমত প্রকাশে সংকুচিত হয়। অথচ মুক্ত চিন্তাই মানুষকে সৃজনশীল করে, নতুন পথের সন্ধান দেয় এবং আত্মপরিচয়ের দিকে এগিয়ে নেয়। যে মানুষ ভাবতেই পারে না, সে কখনোই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে না। অনেকেই সমাজের নির্ধারিত ছকে নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে নিজের স্বপ্ন, পছন্দ ও ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়। তখন জীবন হয় নিয়ম মানার অভ্যাস, আনন্দ নয়। স্বাধীনভাবে বাঁচা মানে দায়িত্বহীন হওয়া নয়, বরং নিজের সিদ্ধান্তের দায় নিজে নেওয়ার সাহস রাখা। এই সাহসই মানুষকে আত্মসম্মান শেখায় এবং জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি করে। অনুভবের স্বাধীনতা সম্ভবত সবচেয়ে উপেক্ষিত, অথচ সবচেয়ে মানবিক দিক। আমাদের শেখানো হয়—কিছু অনুভূতি প্রকাশ করা দুর্বলতা, কিছু অনুভূতি অপ্রয়োজনীয়। ফলে মানুষ হাসতে জানে, কিন্তু কাঁদতে ভুলে যায়; ভালোবাসতে চায়, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস পায় না। অনুভবকে দমিয়ে রাখা মানে নিজের ভেতরের মানুষটিকেই অস্বীকার করা। মুক্তভাবে অনুভব করতে পারা মানে নিজের আবেগকে স্বীকার করা, তাকে সম্মান করা এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষ হওয়া।

অতএব স্বাধীনতা কোনো একক ধারণা নয়। এটি চিন্তা, জীবনযাপন ও অনুভব—এই তিনের সম্মিলিত রূপ। বাহ্যিক স্বাধীনতা মানুষকে পথ দেখায়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাই মানুষকে সম্পূর্ণ করে। সত্যিকার স্বাধীন সমাজ সেই, যেখানে মানুষ কেবল বেঁচে থাকে না, বরং নিজের মতো করে ভাবতে পারে, বাঁচতে পারে এবং অনুভব করতে পারে।

ফাস্ট ফ্যাশন: একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে পরিবেশের হিসাব

(তামান্না ইসলাম বাঁধন, ব্যাচ ৭, DTE)

ফ্যাশনকে আমরা বেশিরভাগ সময় স্টাইল, রুচি আর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হিসেবে দেখি। কিন্তু টেক্সটাইল নিয়ে পড়তে গেলে বোঝা যায়, একটি পোশাক শুধু কাপড় নয়, এর ভেতরে আছে ফাইবার, কেমিক্যাল, পানি, বিদ্যুৎ আর পরিবেশের ওপর অদৃশ্য চাপের গল্প। আজকের ফাস্ট ফ্যাশন শুধু বাজারের ট্রেন্ড না; এটা এমন এক শিল্পব্যবস্থা, যা দ্রুত উৎপাদনের পেছনে ছুটতে গিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে ক্রমাগত ঋণ নিচ্ছে।

১. পানির ব্যবহার আর কাঁচামালের চাপ:
টেক্সটাইল খাত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পানি ব্যবহারকারী শিল্পগুলোর একটি। একটা সাধারণ সুতি টি-শার্ট বানাতে প্রায় ২,৭০০ লিটার পানি লাগে, যেটা একজন মানুষের বহু মাসের পানির চাহিদার সমান। তুলা চাষই পানি-নির্ভর, তার ওপর স্পিনিং, ডাইং, ওয়াশিং প্রতিটি ধাপেই পানি খরচ হয় বিপুল পরিমাণে। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে যখন পুরো প্রসেস চেইনটা দেখা হয়, তখন বোঝা যায় এই চাহিদা সরাসরি ভূগর্ভস্থ পানির ওপর কত বড় চাপ তৈরি করছে।

২. রং আর রাসায়নিক দূষণের বাস্তবতা:
কম দামে দ্রুত উৎপাদন ফাস্ট ফ্যাশনের মূল লক্ষ্য। এই তাড়াহুড়োয় অনেক কারখানায় সস্তা ডাই আর কেমিক্যাল ব্যবহার হয়, যেগুলোর বর্জ্য সরাসরি পানি দূষণ ঘটায়। ডাইং সেকশন থেকে বের হওয়া বর্জ্যে ভারী ধাতু আর বিষাক্ত উপাদান থাকতে পারে, যা নদী-খাল ধ্বংস করে দেয়। বইয়ে আমরা ETP বা বর্জ্য পরিশোধন নিয়ে পড়ি, কিন্তু বাস্তবে খরচ বাঁচাতে সেটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। এর প্রভাব পড়ে পুরো জলজ পরিবেশে।

৩. সিন্থেটিক ফাইবার আর কার্বন চাপ:
পলিয়েস্টার, নাইলনের মতো সিন্থেটিক ফাইবার এখন ফাস্ট ফ্যাশনের মেরুদণ্ড। এগুলো তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম থেকে, আর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লাগে বিপুল এনার্জি। ফলে কার্বন নিঃসরণ বাড়ে দ্রুত। বৈশ্বিক হিসেবে ফ্যাশন শিল্প একাই মোট কার্বন নিঃসরণের উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য দায়ী যা পরিবহন খাতের বড় অংশের সমান। পোশাকের ট্যাগে এই হিসাব লেখা না থাকলেও পরিবেশ ঠিকই তার দাম দিচ্ছে।

৪. মাইক্রোপ্লাস্টিকের অদৃশ্য বিপদ:
সিন্থেটিক কাপড় ধোয়ার সময় ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা পানির সাথে বের হয়ে যায়। একেকবার ওয়াশে লাখ লাখ মাইক্রোফাইবার ছড়িয়ে পড়ে, যেগুলো সাধারণ পরিশোধন ব্যবস্থায় ধরা পড়ে না। এগুলো নদী পেরিয়ে সমুদ্রে যায়, তারপর মাছের শরীর হয়ে আবার আমাদের খাবারে ফিরে আসে। এই চক্রটা নীরব, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ভয়ংকর।

৫. টেক্সটাইল বর্জ্য আর অপচয়ের চক্র:
ফাস্ট ফ্যাশনের মডেলটা খুব সহজ: বানাও, বিক্রি করো, ফেলে দাও। পোশাক টেকসই করার বদলে দ্রুত বদলানোর জন্য বানানো হয়। ফলে প্রতি মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ কাপড় ল্যান্ডফিলে জমা হচ্ছে বা পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। অথচ এই বর্জ্যের বড় অংশই রিসাইকেল করা সম্ভব। সমস্যা প্রযুক্তির অভাবে নয়, বরং পরিকল্পনার অভাবে ডিজাইন পর্যায়েই সার্কুলার চিন্তার ঘাটতি।

আমাদের ভূমিকা: আগামীর ইঞ্জিনিয়ার

শুধু সমালোচনা করে থেমে থাকলে হবে না। টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের কাজ সমাধানের পথে হাঁটা। যেমন:
1. Waterless dyeing প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা
2.Biodegradable ও recycled fiber ব্যবহার বাড়ানো

3.উৎপাদনে Zero Liquid Discharge নিশ্চিত করা

ফ্যাশন তখনই টেকসই হবে, যখন উৎপাদন আর প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। এই ভারসাম্য তৈরি করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমাদেরই, যারা শিল্পটা ভেতর থেকে বুঝি এবং বদলানোর ক্ষমতাও রাখি।

টেক্সটাইল এর ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ

(উম্মে হাবিবা, ব্যাচ ২, AMM)

টেক্সটাইল এর ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ
বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে টেক্সটাইল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতা, কাপড় ও বস্ত্রশিল্প কেবল জীবনের প্রয়োজনই মেটায়নি বরং এই শিল্প গড়ে তুলেছে মানুষের পরিচয়, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ইতিহাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টেক্সটাইল হয়ে উঠেছে শক্তির প্রতীক, স্বাধীনতার ভাষা ও আত্মপরিচয়ের চিহ্ন। মুঘল যুগ থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তান পর্ব, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ও আধুনিক যুগ—প্রতিটি ধাপেই টেক্সটাইল শিল্প বাংলার ইতিহাসকে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছে কিংবা নতুন রূপ দিয়েছে বলা হয়।

"ছাই থেকে উড়ান : টেক্সটাইলের ফেরার গান"

মুঘল আমলে (১৫২৬-১৭৫৭) বাংলার মসলিন, সুতি বস্ত্রে চূড়াত গৌরব, ছিল গুণে প্রাচীন সিংহাসন, হাতের বুননে শিল্পের আলো, বিশ্ব চিনত নাম, রাজপরিবারের পছন্দে ছিল রঙের ধাম।

ঔপনিবেশিক যুগ (১৭৫৭-১৯৪৭) ঝড় বয়ে গেল, হাততাঁতের শিল্প হারালো, নিভে গেল কারিগরদের খেল। মিল উঠল, শোষণ চেপে ধরল স্বপ্নের গান, বাংলা কাঁচামালের দেশ হয়ে দাঁড়ালো পরাধীন মান।
পাকিস্তান পর্বে (১৯৪৭-১৯৭১) থেমে ছিল শিল্পের পথ, সীমিত ছিল মিল, সীমিত স্বপ্ন, থমকে গেল রপ্তানি তার জ্যোতি। তবু বুকের আগুন নিভে না—ছিল লড়াইয়ের জোর, স্বাধীনতার ডাক এলেই জেগে উঠল নতুন ভোর।
স্বাধীন বাংলাদেশে (১৯৭১-১৯৯০) ঘুরে দাঁড়ালো দেশ, সুতা, কাপড়, গার্মেন্টস গড়ে উঠল নতুন প্রেসস, রপ্তানিমুখী শিল্পে দেশ পেল আশা ও পথ, অর্থনীতিতে টেক্সটাইল হলো শক্তির রথ।
আধুনিক যুগে (১৯৯০-বর্তমান) বিশ্বমুখী বাংলা আজ, যন্ত্র, প্রযুক্তি, দক্ষতায় বদলে গেছে পরিচয় তার রাজ, ছাই থেকে জেগে উঠা শিল্প, পাখি হয়ে উড়াল, টেক্সটাইলের ফিরে আসা—"সংগ্রাম থেকে সাফল্য"।

বাংলাদেশ আজ একটি শক্তিশালী টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত. দক্ষ শ্রমশক্তি, বৃহৎ উৎপাদন কাঠামো, রপ্তানিনির্ভর শিল্পনীতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা—সব মিলিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব টেক্সটাইল মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ নাম. এটি শুধু একটি শিল্পের অবস্থান নয়—এটি একটি দেশের আত্মপরিচয়, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতীক.
পরিশেষে বলা যায়,

মসলিন শুরু হওয়া বাংলার টেক্সটাইল ইতিহাস শুধু শিল্পের গল্প নয়—এটি এক জাতির আত্মপরিচয়ের গল্প. হাত-তাঁতের বুননে জন্ম নেওয়া সেই ঐতিহ্য ঔপনিবেশিক ঝড়ে হারিয়েছিল তার দ্যুতি; অবহেলা, শোষণ আর বৈষম্যের পথে হারিয়ে গিয়েছিল কারিগরের স্বপ্ন. কিন্তু ইতিহাস থেমে থাকে না, স্বাধীনতার আলোয় জেগে উঠল সুতো, কাপড় আর কারখানার গান. আধুনিক টেক্সটাইল ফ্যাশন এর সাথে স্মার্ট ফ্যাক্টরি, মেডিকেল টেক্সটাইল, ইকো-ফ্রেন্ডলি ফাইবার টেক্সটাইল সহ উৎপাদন ব্যবস্থা আর উদ্ভাবনের এক বিস্তৃত দিগন্ত. এটি উন্নয়নের গল্প নয় শুধু—এটি এক জাতির পুনর্জাগরণের গান.

"রঙিন সুতো"

গ্রামের ছোট্ট ঘরে বসে বৃদ্ধ তাঁতি "রহমান চাচা" হাতে তাঁত চালান—তাঁর আঙুলে বয়সের ছাপ, চোখে স্মৃতির রেখা। নাতনী মুনিয়া একদিন জিজ্ঞেস করল, "দাদু, এত কষ্ট করে কেন এখনো তাঁত বুনো?"

রহমান চাচা মুচকি হাসলেন, বললেন, "এই সুতোর ভেতর শুধু কাপড় নেই আম্মু, আছে 'ইতিহাস', আরও আছে মুঘল আমলের গৌরব, ইংরেজ আমলের কষ্ট, মুক্তিযুদ্ধের আগুন এবং স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন। রহমান চাচা আরও বলেন, "এই সুতোই একদিন আমাদের বাঁচিয়েছে, এই সুতোই আমাদের পরিচয় বানিয়েছে।" তাঁর শব্দের লুকিয়ে আছে শত বছরের ইতিহাস, সংগ্রাম আর গর্ব।
তাঁতের মাকু ও স্বাধীনতার স্বপ্ন

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস। টাঙ্গাইলের এক নিঝুম গ্রাম। প্রবীণ তাঁতি করিম শেখের বাড়িতে তখন মাকুর খটখট শব্দ থেমে নেই। কিন্তু করিম শেখ এবার সাধারণ শাড়ি বুনছেন না। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের যাতায়াত। একদিন রাতে কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা করিম শেখের কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিলো। তাদের পরনের কাপড় ছিল জীর্ণ। করিম শেখ তাঁর সিন্দুকে রাখা সবচেয়ে ভালো সুতা বের করেন। সারারাত প্রদীপের আলোয় মাকু চালিয়ে তিনি তৈরি করলেন আদরের মোটা চাদর। প্রতিটি সুতার ভাঁজে ভাঁজে গেঁথেছিলেন আগামী স্বাধীনতা। বিদায়বেলা তাদের হাতে চাদর তুলে দিয়ে তিনি বললেন, "রেখো বাজান, এইটা শুধু কাপড় না, এইটা তোমাদের ঘরের মানুষের দোয়া। এই চাদর যেন তোমাদের হিম আর শত্রুর বুলেট থেকে বাঁচিয়ে রাখে।"

সেই রাতে করিম শেখের তাঁতের মাকু শুধু কাপড় নয়, বুনেছিল একটি দেশের ভাগ্য। আজ যখন লাল-সবুজের পতাকা বাতাসে ওড়ে, করিম শেখের উত্তরসূরিরা মনে করেন—সেই পতাকার প্রতিটি সুতায় মিশে আছে এক একটি যুদ্ধের গল্প।

কবিতা:

"টেক্সটাইল ফিরে আসার কথা"

মুঘল আমলে মসলিনের খ্যাতি ছিল প্রাণ,
ঔপনিবেশিক ঝড়ে নিভে গেল তাঁতের গান।
পাকিস্তান পর্বে থেমে গেল স্বপ্নের প্রদীপের আলো,
স্বাধীনতার পরে জেগে উঠল নতুন দিনের ভালো।
ছাই থেকে ওঠা আগুন হয়ে, শিল্প ফিরল ঘরে,
সুতা-কাপড়ে স্বপ্ন বুনে দেশ দাঁড়ালো নতুন করে।
আজ বিশ্ববাজারে বাংলার নাম গর্বের পরিচয়,
টেক্সটাইল ফিরে আসার গল্প— "উন্নয়নের জয়।"
"টেক্সটাইল শুধু শিল্প নয়, এটি জাতির আত্মার বয়ন।"

অন্ধ ইউক্যালিপটাস

(মো. ওমর হাসান, ব্যাচ ৭, DTE)

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে
এক অন্ধ ইউক্যালিপটাস,
ছুঁতে চায় আকাশ–
কিন্তু মাটির কান্না শোনেনা।
আমি তাকে প্রশ্ন করলাম–
তোমার মধ্যে কি কোন দয়া নেই?
উত্তরে সে বললো,
মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ।
আমি আর প্রশ্ন করিনি।
হঠাৎ মনে হলো–
আমার শেকড়ও কি
কারো স্বপ্ন শুষে নিচ্ছে না তো?

সুতোর ভাষায় বোনা ঐতিহ্য: জামদানির আত্মকথা

(হাবিবা আলতাফ, সিনিয়র প্রভাষক, DTE)

শাড়ি প্রত্যেকটি নারীর একটি অনুভূতির জায়গা। এই অনুভূতির একটি বড় অংশ দখল করে আছে জামদানি শাড়ি। প্রতিটি সৃষ্টির যেমন একটা ইতিহাস আছে জামদানি শাড়ি তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে প্রতিটি নকশা ও বুনন শুধু সৌন্দর্যের গল্পই বলে না ফুটিয়ে তোলে আবহমান বাংলার একটি জনপদের অভিব্যক্তির কথাও। জামদানি জন্মকথা জানতে গেলে আমাদের মসলিন সম্পর্কে আগে জানতে হবে। এককালে মসলিন ছিল অন্যতম শাড়ি যা আভিজাত্যের প্রতীকও বলা হত। বংশানুক্রমে এর বুননশৈলী পরবর্তীতে দক্ষ শিল্পীর অভাবে হারিয়ে যায়, যা আজও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কালের পরিক্রমায় জামদানি শাড়িকেই তাই ধরা হয় মসলিনের উত্তরাধিকারী হিসেবে। মসলিনের মতোই জামদানির ইতিহাস ও তাই বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। যেই জামদানিকে আজ আমরা চিনি তার খোঁজ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কাল থেকে। এই শাড়ির সবচেয়ে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তের "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থটি থেকে, যা লেখা হয়েছিল আনুমানিক ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। সেখানে চাণক্য (তৎকালীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ) উল্লেখ করেছেন তখনকার বঙ্গ ও পূর্ণবর্ধন (বর্তমানে বগুড়া) অঞ্চলে কিছু কাপড়ের কারখানার কথা, যেখানে মিহি কাপড়ের উৎপাদন করা হতো। তাছাড়া খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রচিত উইলিয়াম এইচ সফের বই "পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সি" তে উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গ অঞ্চলের মিহি বস্ত্রের বিবরণ। এ থেকেই বোঝা যায় বঙ্গ অঞ্চল মিহি সুক্ষ কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এইসব ঐতিহাসিক বর্ণনা বিশ্লেষণ করে জানা যায় সেই মিহি বস্ত্রটি ছিল মসলিন, আর এই মসলিনের করা নকশা থেকেই জামদানি শাড়ির উৎপত্তি।

জামদানি শাড়ির নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। "জামদানি" শব্দটি মূলত ফার্সি ভাষা থেকে আগত। ফার্সিতে "জাম" অর্থ সুপেয় মদ ও "দানি" অর্থ পেয়ালা। অর্থাৎ ইরানী মদ পরিবেশনকারীদের পরিহিত মসলিন পোশাক থেকে হয়তো জামদানি নামটি এসেছে। এর নামকরণ নিয়ে অনেকগুলো ব্যাখ্যা থাকলেও এই ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা পায়। যেহেতু ফার্সি শব্দ তাই মনে করা হয় ভারতবর্ষে আগত মুসলমানদের মাধ্যমেই জামদানির প্রচার ও বিস্তার ঘটে। শুধু বুনন শৈলী নয় বাংলার উর্বর মাটি ও আবহাওয়া জামদানি তৈরিতে অন্যতম প্রভাব ফেলে। যদিও এই শাড়ির কারিগররা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন, তবে ঢাকা জেলাতেই এই শাড়ি সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা লাভ করে। তাই আদি কালের এই জামদানি "ঢাকাই জামদানি" নামে পরিচিত। ঢাকার সোনারগাঁও, বাজিতপুর ও ধামরাই অঞ্চল এই শাড়ি উৎপাদনের শীর্ষে ছিল। শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়াতে এই অঞ্চলের জলবায়ু সুতার আর্দ্রতা ও গঠনে ভূমিকা রাখে। তাই ফুলিয়া ও ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকায় জামদানি শাড়ি তৈরি হলেও ঢাকাই জামদানির আবেদন আজও অন্যরকম। জামদানি শাড়ির অন্যতম আকর্ষণ সূক্ষ্ম নকশা ও কারুকার্য। জামদানি শাড়ির নকশায় খেয়াল করলে দেখা যাবে এটিতে মুঘল ও পারস্যের শিল্পনীতির প্রভাব রয়েছে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই ফুলেল জামদানির প্রচলন শুরু হয়েছিল। এর আগে তাঁতিরা সাধারণত সহজ নকশা ব্যবহার করত যাতে সময় কম লাগে। ১৯৬০ এর দশকে লাল জামদানির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। বিয়েতে লাল জামদানি আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হতো। মুঘল আমলে তৈরি বেশিরভাগ জামদানির নকশাগুলো ইরাক, ফারসি ও তুর্কিস্তানের কার্পেটের নকশার আদলে করা। যেমন গোলাপ বুটি, চামেলী বুটি, ঝালর বুটি এসবই ইরান ও তুর্কিস্তানের কার্পেটের নকশা থেকে আগত। এসব নকশা মুঘল সাম্রাজ্যের শৈল্পিক দিক বিবেচনা করলেও পাওয়া যায়। অন্যান্য নকশা যেমন মস্তক ফুল, করলা, কৃষ্ণচূড়া, জবা, ময়ূর সবই তাঁতিদের কল্পনার আদলে ফুটিয়ে তোলা নকশা, যার অনুপ্রেরনা এসেছে প্রকৃতি থেকে। আবহমান বাংলার মাদুলি, কল্কি, বট পাতা, পান পাতা, পানা ফুলও জামদানি নকশায় স্থান পেয়েছে। তাঁতিরা তাদের মনের অনেক না বলা কথাও এ শাড়ির নকশায় স্থান দেন। তাই প্রকৃতি আর কল্পনার জগতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন এই শাড়ি।

২০১৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো জামদানি শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্থান দিলেও তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা আজও করুন। তাঁতিদের নতুন প্রজন্মের বিমুখতা তাই এই পেশার প্রতি প্রকট। কালের স্রোতে নিত্যনতুন ফ্যাশন ট্রেন্ডের ভিড়ে বাঙালি নারীদের শাড়ি প্রেম এখন শুধুমাত্র উৎসব নির্ভর। শুধুমাত্র পূর্বপুরুষদের দিয়ে যাওয়া পেশা নয়, তাঁতিরা আজও জামদানি শাড়িকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ থেকে। নতুন প্রজন্মের ঐতিহ্যগত টান আর জাতিসত্তার প্রতি দায়িত্ববোধই পারে এই শিল্পকে বাঁচাতে। তাই সমরেশ বসুর একটি উক্তি দিয়ে শাড়ি জন্মের এই কথন শেষ করতে চাই,

"অনুগ্রহ আর সংস্কৃতি যখন হাত মিলিয়েছিল,
তখনই শাড়ির জন্ম হয়েছিল।

বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড:
স্টাইল, আধুনিকতা ও স্বকীয়তার মেলবন্ধন

(আনিকা আক্তার তানজিম, ব্যাচ ১১, DTE)

সময়ের আবর্তনে ফ্যাশন জগত সবসময়ই পরিবর্তনশীল, তবে বর্তমান সময়ের ফ্যাশন ট্রেন্ডে এসেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আধুনিক তরুণ প্রজন্মের কাছে ফ্যাশন এখন কেবল বাহ্যিক জৌলুস নয়, বরং নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্যের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ।

এ বছরের ফ্যাশন মানচিত্রে 'মিনিমালিজম' বা স্নিগ্ধতা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। গাঢ় রঙের চেয়ে হালকা ও প্রাকৃতিক রঙের (Earth tones) পোশাক এখন সবার পছন্দের শীর্ষে। ভার্সিটির করিডোর থেকে শুরু করে অফিস—সবখানেই এখন রাজত্ব করছে 'ফিউশন ফ্যাশন'। পাশ্চাত্য কাটিংয়ের সাথে দেশীয় মোটিফের মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি টপস, কুর্তি কিংবা জিন্সের সাথে হ্যান্ডলুম কটির ব্যবহার আমাদের ফ্যাশনে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।আধুনিক ফ্যাশনে আরামকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে—ওভারসাইজড সিলুয়েট, কো-অর্ড সেট, লুজ ফিট পোশাক এবং সফট ফ্যাব্রিক এখন তরুণ প্রজন্মের প্রথম পছন্দ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো 'সাসটেইনেবল ফ্যাশন' বা টেকসই পোশাকের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে তরুণরা এখন সিন্থেটিক বর্জন করে সুতি, লিনেন ও খাদি কাপড়ের দিকে ঝুঁকছে। আরাম আর আভিজাত্যের এই অপূর্ব সমন্বয়ই মূলত বর্তমান ফ্যাশনকে করে তুলেছে অনন্য। দিনশেষে যা নিজের ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে এবং নিজেকে আত্মবিশ্বাসী রাখে, সেটিই এখনকার আসল ট্রেন্ড।

নিউ নর্মাল; এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই

(মো: ফাইজুল্লাহ কৌশিক, রেজিস্ট্রার, ISU)

"পৃথিবীর সকল অবস্থা সাময়িক।
পরিস্থিতি যাই ইউক শেষে আপনিই জিতবেন
–দরকার শুধু অনুশীলন এবং লেগে থাকা'"

বিশ্ব জগতের মালিক যা কিছু নিয়ে নিয়েছেন ঐগুলি কোনো ব্যক্তি বা মানুষের জীবনে এখন আর দরকার নেই। এই বস্তুগুলো নিজের নিকট রেখে দেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও সম্ভব হতো না। কারণ এই মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা আপনার জন্য অন্য রকম। কী সেই ইচ্ছা? পড়তে থাকুন.... মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো কাজ না করে পেতে চাওয়া। মানুষ ভালো ইনকাম চায়, ভালো পজিশন চায়, সামাজিক মর্যাদা চায় এবং পাওয়ার চায়। কিন্তু ঠিক একই রকম যোগ্যতা দিয়ে এখনকার চেয়ে আরও বেশি অর্জন সম্ভব হবে না –এই বিষয়টি মানুষ মাথায় রাখে না।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে আরও বেশি দামি মানুষ বানাতে চান। তিনি আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চান 'হে বান্দা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে অন্য এক বিশ্ব, যেখানে তুমি আরও বেশি মর্যাদার চেয়ারে বসবে। ঐ চেয়ারে বসার জন্য দরকার তোমার (আমি যে যোগ্যতা তোমাকে দিয়েছি) যোগ্যতা গুলি কাজে লাগানো। স্মরণে রাখো, ঐ চেয়ারে তোমাকে বসতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি নিজের যোগ্যতার একক ফলো করবে, ততো তাড়াতাড়ি তুমি ঐ চেয়ারের বসবে'।

সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সিলেবাস হলো: আমাকে (আল্লাহকে) সবচেয়ে বেশি ভালবাসো। যে বস্তু আমার (আল্লাহর) চেয়ে বেশি ভালোবাসবে আমি (আল্লাহ্) তা নিয়ে নিব। নিজের উপর ইনভেস্ট করো। মুখের, হাতের, পায়ের, চোখের এবং চিন্তার লাগাম টেনে ধরো। তোমার পেশনের কাজে মনোযোগ দাও। ধরে নাও বিচারের দায়িত্ব তোমার হাতে, ঐ ভাবে ইনসাফ করো। স্বাস্থ্য রক্ষা করে কাজ করো। তোমার সউলের খবর দাও। ইন্টারনাল কোয়ালিটি বৃদ্ধি কর। নিজের কাছে ১০০% ক্লিয়ার থাক। বিশ্বাসে রাখো: এখন যে ধরনের অনুশীলন করবে, ভবিষ্যতে ঐ রকমই হবে। কৃতজ্ঞ হও। তোমার মাধ্যমে যেন কেউ ক্ষতিতে না পড়ে সেই দিকে মনোযোগ দাও। ১০০% বিশুদ্ধ চিন্তা করো। রিস্ক নাও। ভালো কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দাও। কখনই লানিং বন্ধ কোরো না। কারণ- নম্বর, স্কোর, যোগ্যতা, পজিশন, অধ্যয়নকে ফলো করে, অর্থাৎ যিনি লার্নিং করবে, অধ্যয়ন করবে, দক্ষতা বাড়াবে, সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান অর্জন করবে, নিজেকে কারেকশন করবে- নম্বর, স্কোর, পজিশন, তাঁর দিকে যাবে। বিশ্বাসে রাখো: এই ডিরেকশনস মহাবিশ্বে রেখে দেয়া মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার বার্তা বা নির্দেশনা। এইগুলি মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ তৈরি করে দেয়।

সৃষ্টি জগতে যা কিছু রয়েছে –সবই পরিবর্তনশীল। আজ আপনি খুব ভালো অবস্থানে বা খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। আপনার বর্তমান অবস্থা 'পরিবর্তন থিউরি' এর মধ্যে অবস্থান করছে। 'পরিবর্তন থিউরির' কারণে বহু চেষ্টা করেও ঐ একই অবস্থানে থাকা সম্ভব হবে না। অবস্থার পরিবর্তন হবেই। অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। 'পরিবর্তন থিউরি' ইঙ্গিত করে, 'প্রতি ১০ বৎসর পর পর প্রতিটি মানুষের মধ্যে ১টি বড় পরিবর্তন ঘটে'। যেমন:

ভালো অবস্থান, ভালো সময় –অপেক্ষা করছে কঠিন সময়
খারাপ অবস্থান, খারাপ সময় –অপেক্ষা করছে সহজ সময়

কঠিন সময়, চরম অবস্থা, বিপর্যয়, ট্রমা, ভাটা অবস্থা, মানহানি অবস্থা, অর্থ কষ্ট –এইগুলি মানুষের পরবর্তী সময়কে সহজ করে দেয়। এই পরিবর্তন সকল মানুষের

জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মনোযোগ দিন –আজকে যে গাছটিতে ১০০টি ফল ধরেছে, ১০ বৎসর পরে ঐ একই গাছে হয়তোবা ১০টি ফল ধরবে। আজকে যে বাগান ১০০ টন ফল দিচ্ছে, ১০ বৎসর পর ঐ একই বাগান থেকে (বাগানের পরিধি এবং নতুন গাছ না বাড়ালে) ফল পাওয়া যাবে হয়তোবা ১০ টন।

'নিউ নরমাল' বলছে: প্রত্যেক ১০ বৎসর অন্তর অন্তর প্রতিটি মানুষকে সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হবে। যে সকল মানুষ 'নিউ নরমাল' মেনে নিয়ে পূনরায় চরতে শুরু করবে, তারা এগিয়ে থাকবে। নিউ নরমাল থিউরি আরও বলছে। পরিবর্তন মেনে নিয়ে যারা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে পেশনের কাজ চালাতে থাকবে তারা কাজটিকে পসিবল করতে সক্ষম হবে।

চিত্র: সময়ের সাথে মানুষের অবস্থান পরিবর্তন

Functional Textiles with Smart Properties:

Green Approaches & Sustainable Applications

(Borhan Uddin Khan, Lecturer, DTE)

1. Introduction

Functional textiles are textile and clothing materials that possess specific functional properties beyond their conventional uses. The functionalization process improves existing characteristics or introduces new functionalities into textile substrates. Functional properties can be incorporated into textiles through several approaches.

Material functionalization: This involves the selection and engineering of polymer and fiber properties.
Mechanical functionalization: This can be achieved by engineered yarns, seamless product construction, fully-fashioned or seamless style in knitting, etc.
Chemical functionalization: This can be achieved by using a variety of selected agents in finishing processes.
Clothing functionalization: This involves specific pattern development, engineered parts assembly, layering, etc.

The functional performance of textiles can be enhanced through careful selection of raw materials and strategic design of fabric structures. Both fibers (natural, regenerated, and synthetic fibers) and functional materials (conductive, antimicrobial agents, flame-retardant, etc.) work together to integrate properties into textiles. The clothing and textile industry is shifting towards the circular economy from the linear economy. Therefore, eco-friendly manufacturing techniques have become essential in the functional textile sectors. Since traditional finishing and processing methods consume high levels of energy, water, and chemicals, green approaches will minimize those ecological impacts. Researchers around the world have reported numerous studies to improve the efficiency of these methods, and their collective contribution can lead to a responsive and future-oriented functional textile value chain.

2. Application of Sustainable Functional Wearable Textiles

2.1 Medical Textiles

Sustainable medical textiles have emerged as a major research focus due to their potential to reduce the global burden caused by the extensive use of disposable garments. Conventional medical textiles, such as surgical gowns, gloves, personal protective clothing, etc, are mostly manufactured from polypropylene and polyester. Although they offer strong protection against chemical and biological threats, they are non-biodegradable and contribute heavily to long-term plastic pollution. Sustainable medical textiles aim to integrate biodegradable, recyclable, and renewable materials while maintaining necessary protection against fluids, pathogens, and particulate transmission. Promising alternatives to traditional materials include biodegradable polymers such as polylactic acid (PLA), recycled materials like rPET and rPP, and natural biopolymers such as chitosan, seri-

cin, alginate, and cyclodextrin, which have lower chemical toxicity and environmental threats.

2.2 Flame-Retardant Textiles

Flame-retardant (FR) textiles are engineered to resist ignition, slow down the rate of flame spread, and prevent combustion when exposed to a heat source. The flame-retardant finishing enhances the textile's ability to self-extinguish or minimize fire damage while protecting the wearer. Flame-retardant materials, such as halogenated compounds, phosphorus-based chemicals, and antimony additives, are commonly applied to textiles due to their high efficiency and cost-effectiveness. However, these compounds can release HCl, HBr, CO, dioxins, and furans when exposed to fire, which can irritate the respiratory system and reduce air quality. Sustainable flame-retardant textiles are mostly based on bio-based and non-toxic materials such as biomass-derived carbon dots, DNA, phosphorylated polysaccharides, chitosan, alginate, plant extracts (e.g., tannins or phytic acid), etc. Numerous studies have reported promising outcomes using these green approaches.

2.3 UV-Protective Textiles

Ultraviolet (UV)-protective textiles are engineered to shield the wearer from harmful ultraviolet radiation (UV-A and UV-B) by blocking or absorbing radiation. These types of fabrics reduce the risk of sunburn, skin damage, and long-term health risks such as skin cancer. They are usually rated by Ultraviolet Protection Factor (UVPF), which indicates how much longer one can stay safely under the sun. Conventional UV-protective textiles are commonly developed using inorganic compounds such as titanium dioxide and zinc oxide, UV-absorbing chemical finishes, dye-based treatments, or dense synthetic fibers like polyester. To mitigate the toxic effects of conventional UV-protective textiles, the use of natural-based organic elements, mainly plant extracts, is the most viable option for developing sustainable UV-protective textiles. The plant extracts show intense self-defence activity against UV radiation due to their photochemical activities. Based on their intrinsic photochemical activities, certain naturally occurring compounds like carotenoids, alkaloids, flavonoids, and tocopherols show excellent UV-protection properties. For example, Aloe vera leaf extract is the most widely recognized naturally occurring UV absorber, and it also shows non-cytotoxic, antimicrobial, wound-healing, and other therapeutic properties. The Tagetes erecta flower is another source of naturally occurring UV-protectors, which contain carotenoid compounds like lutein and lutein ester. The next generation UV-blocking protective textiles will be based on optimum and eco-friendly techniques, which will show better performance, durability, and circularity. Therefore, researchers are working on different eco-friendly solutions for UV-protective textiles to ensure a better future.

2.4 Water-Repellent Textiles

Water-repellent properties are generally achieved by incorporating a water-repellent coating, which forms a hydrophobic textile surface. Traditional water-repellent agents include fluorochemicals, silicones, and paraffin waxes. Though these agents have higher efficiency in providing water resistance, they raise serious environmental and health concerns. Recent studies suggest that bio-based materials like natural oils and plant-derived compounds could be attractive alternatives due to their non-toxic characteristics, renewability traits, and biodegradability. For example, plant oils, including castor oil and soybean oil, can be used to devel-

op hydrophobic coatings through esterification or cross-linking techniques. Moreover, the sol-gel process is a widely used method for producing water-repellent textiles. Nature-driven silica and titanium dioxide nanoparticles are often used in the sol-gel process to get hydrophobic surfaces. They are biodegradable and durable compared to the traditional ones. Furthermore, surface modification techniques like grafting, plasma treatment, and enzymatic modification have been proven to enhance the hydrophobicity of textiles without employing toxic chemcals.

3. Challenges and Future Directions

3.1 Challenges of Sustainable Functional Textiles

The advancement of sustainable functional textiles faces certain challenges. First, scalable production remains a significant barrier to the development of sustainable functional textiles. Industries are increasingly advancing eco-friendly protective clothing in the market, but the transition from laboratory-scale methodologies into large-scale manufacturing often results in compromises in functional performance and economic viability. Another critical barrier is the lack of consumer awareness and acceptance regarding sustainable functional textiles. Consumers often perceive the sustainability term as ambiguous. Most of these sustainable textiles are not cost-effective due to scalability issues. As a result, the large adaptation of these textiles by consumers becomes difficult. Therefore, proper transparency between buyers and consumers, and marketing campaigns to promote sustainable functional textiles, is necessary to hold the attention of the consumers. Furthermore, the recycling of functional textiles remains particularly challenging due to the presence of complex materials and chemicals used to impart functionalities. The use of biodegradable materials and advanced recycling technology may significantly improve the end-of-life challenges by enhancing material recoverability, reducing environmental burden, and supporting circularity in sustainable functional textile systems.

3.2 Future Directions & Research Needs

The rise of functional textiles opens an emerging avenue toward a prospective solution for the next generation of on-body devices. The integration of smart electronics into functional textiles will enhance performance, durability, and user experience. The functional textiles used in wearable technology are expected to have self-power systems and be flexible enough to be sewn on any garments. The presence of multifunctionality is another significant research interest. Studies show that these types of approaches can develop durable and eco-friendly functional textiles. Moreover, researchers should focus more on meeting the circularity challenges of functional textiles. There are certain strategies, such as design for recycling and disassembly, reduction of material complexity, adoption of advanced recycling technologies, standardization, and material traceability, which could address the circularity challenges in functional textiles. Furthermore, integration of AI and machine learning within the supply chain of functional textiles may improve the efficiency of overall production. The application of the Internet of Things (IoT) may also enhance transparency, traceability, and accountability in the management of textile waste. Therefore, researchers and industry experts should work together on interdisciplinary collaborations, viable commercialization methods, and sustainable innovations to advance the progress of

sustainable functional textiles.

References:

1.Zhang, Y., et al., Functional textiles with smart properties: their fabrications and sustainable applications. Advanced functional materials, 2023. 33(33): p. 2301607.
2.Haleem, A., et al., A pervasive study on Green Manufacturing towards attaining sustainability. Green Technologies and Sustainability, 2023. 1(2): p. 100018.
3.Rahaman, M.T., et al., Green production and consumption of textiles and apparel: Importance, fabrication, challenges and future prospects. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2024. 10(2): p. 100280.
4.Thakker, A.M. and D. Sun, Sustainable plant-based bioactive materials for functional printed textiles. The Journal of the Textile Institute, 2021. 112(8): p. 1324-1358.
5.Karim, N., et al., Sustainable personal protective clothing for healthcare applications: a review. ACS nano, 2020. 14(10): p. 12313-12340.
6.Rahaman, M.T., Sustainable Functionalization of Biodegradable Antimicrobial Materials for Healthcare Textiles: A Comprehensive Review. Hybrid Advances, 2025: p. 100580.
7.Kundu, C.K., R. Yu, and B. Fei, Green Flame Retardants for Sustainable Polymers with Promising Multi-Functionalities: A Next-Generation Approach. Advanced Sustainable Systems, 2025. 9(9): p. e00162.
8.Saha, B., et al., A comprehensive review of ultraviolet radiation and functionally modified textile fabric with special emphasis on UV protection. Heliyon, 2024. 10(22).
9.Rahman, M.S., et al., Ultraviolet-blocking protective textiles, in Protective Textiles from Natural Resources. 2022, Elsevier. p. 395-444.
10.Wang, X., et al., Review on water repellent agents for textiles: Advances in green synthesis and sustainable solutions. Results in Chemistry, 2025: p. 102402.
11.Dulal, M., et al., Toward sustainable wearable electronic textiles. ACS nano, 2022. 16(12): p. 19755-19788.
12.Tang, K.H.D., State of the art in textile waste management: a review. Textiles, 2023. 3(4): p. 454-467.

(হারুন অর রশিদ, ব্যাচ ৯, DTE)

Healthcare & Hygiene Textiles for Medical Staff:

Comfort, Safety and Efficiency

(Shourin Alam Mou, Lecturer, AMM)

In the demanding world of healthcare, the textiles worn by medical professionals are far more than just uniforms. They are critical tools designed to provide a barrier against pathogens while ensuring the wearer can perform high-stakes tasks with precision. As medical technology advances, the focus is shifting toward a critical balance: maintaining maximum safety without sacrificing the comfort of the personnel.

1. The Science of Surgical Gowns:

Protection Meets Breathability Surgical gowns are the primary defense in the operating room. However, long procedures can lead to physical exhaustion if the gown does not manage the wearer's physiological needs.

Thermal and Moisture Regulation: Avanced gowns now use breathable materials to maintain skin temperature. Moisture-wicing fabrics are essential to reduce sweat accumulation, which prevents discomfort during intense surgeries.

Sensorial Comfortand Fit: Modern gowns utilize soft, smooth fabrics to minimize skin irritation. Ergonomic designs and "zoned construction"—placing stretch panels in high-movement areas like the shoulders and elbows—allow for a full range of motion.

Disposable vs. Reusable: While disposable gowns minimize cross-contamination and are lightweight, reusable gowns made from high-quality fabrics offer better sustainability and improved moisture management through advanced textile engineering.

2. Critical Equipment: Gloves and Masks

Protection extends to every extremity. The choice of material in these items often depends on the specific clinical need:

Surgical Gloves: Latex remains a favorite for its exceptional elasticity and tactile sensitivity. However, for those with allergies, Nitrile serves as a high-durability, hypoallergenic alternative. To enhance comfort, some modern gloves now feature micro-texturing for better grip and inner coatings to reduce perspiration.

Surgical Masks: The challenge with masks is balancing high filtration efficiency with low breathing resistance. Soft inner layers are now standard to prevent skin irritation during prolonged wear.

3. The High Cost of Discomfort

In most jobs, being uncomfortable is just annoying. But in a hospital, it can be a serious problem.

Research shows that a doctor's clothes aren't just about looking professional—they are a part of their medical equipment. When a surgeon feels itchy, sweaty, or restricted by a heavy gown, their brain starts to focus on that discomfort instead of the surgery. If their clothes are uncomfortable, their accuracy and precision can drop by as much as 30% after just four hours. On the other hand, when a doctor feels cool and comfortable, they can stay focused for 26% longer. It's like having a battery that stays charged for a longer period of time.

4. Cutting-Edge Innovations and Fture Trends

The future of medical textiles lies in "Smart Textiles" and nanotechnology:

Smart Sensors: Microsensors as thin as 100 micrometers are being embedded into fabrics to monitor the vital signs of health metrics in real-time.

Adaptive Thermoregulation: New bio-responsive systems can vary their thermal resistance by up to 40% in response to changes in body temperature.

Self-Cleaning Surfaces: Using nanotechnology, surfaces can now be engineered to be superhydrophobic (water-repelling) or photocatalytic, allowing them to resist contamination and effectively "clean" themselves.

Antimicrobial Technology: Modern finishes, such as silver ion technology, can reduce microbial contamination by over 99.9% even after 50 washing cycles.

The Path Forward

The primary challenge remains the "Material Trade-off"—balancing breathability against the need for a robust fluid barrier. As we look ahead, the integration of Smart Textiles and AI-sensing networks will allow uniforms to monitor health in real-time. By combining nature-inspired de-

signs with sustainable, bio-based fibers, the healthcare industry is ensuring that medical professionals remain safe, sharp, and comfortable in any environment. When we use advanced science to protect those who protect us, the entire healthcare system becomes stronger.

শেষ বিকেলের আলো

(হালিমাতুত সৌদিয়া, ব্যাচ ২, AMM)

গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা পুরোনো বাড়ি। টালির চাল, দেয়ালে ফাটল, আর উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র আমগাছটা যেন সময়ের সাক্ষী। বাড়িটার নাম সবাই জানে—দত্তবাড়ি। কিন্তু সেখানে এখন আর দত্ত পরিবার থাকে না। থাকে শুধু বৃদ্ধা তানু।

তানুর বয়স কেউ ঠিক জানে না। কেউ বলে আশি, কেউ বলে নব্বই ছুঁইছুঁই। সাদা শাড়ি, কপালে ছোট টিপ, আর চোখে এমন এক দৃষ্টি—যেন অনেক কিছু দেখে ফেলেছে, আবার অনেক কিছু দেখার বাকি। প্রতিদিন বিকেলে সে বাড়ির বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখে। গ্রামের লোকেরা ভাবে, সে বুঝি সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হারানো দিনগুলোকে খোঁজে।

এই বাড়িতে একসময় খুব কোলাহল ছিল। স্বামী, দুই ছেলে, এক মেয়ে—সবাই ছিল। সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ জ্বলে উঠত, রান্নার গন্ধে উঠোন ভরে যেত, আর হাসি-ঠাট্টায় ঘর মুখর থাকত। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। স্বামী মারা গেলেন অনেক বছর আগে। বড় ছেলে শহরে চাকরি নিয়ে আর ফেরেনি। ছোট ছেলে বিদেশে। মেয়েটা বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে। ধীরে ধীরে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। তানু কাউকে দোষ দেয় না। সে জানে, সবাই নিজের জীবনের টানে ছুটে গেছে। তবু বিকেলের আলোয় বসে থাকলে বুকের ভেতর কোথাও একটা ব্যথা চুপ করে বসে থাকে।

একদিন বিকেলে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। অসময়ে আসা বৃষ্টি। তানু তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে উঠতে গিয়ে দেখল, আমগাছটার নিচে একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভিজে যাচ্ছে পুরো শরীর। হাতে একটা ছেঁড়া স্কুলব্যাগ।

— "এই ছেলে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?" তানুর গলা কাঁপছিল।

ছেলেটা লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল,

— "বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছি, দিদিমা।"

তানু ওকে ভেতরে ডাকল। তোয়ালে দিল, গরম চা বানিয়ে দিল। ছেলেটার নাম রাহুল। পাশের গ্রামের ছেলে। স্কুল থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি ধরা পড়েছে।

সেই দিন থেকেই বিকেলের সময় রাহুল আসতে লাগল। কখনো গল্প শুনতে, কখনো পড়া বুঝতে। তানু যেন আবার নতুন করে বাঁচতে শুরু করল। সে রাহুলকে গল্প শোনাত—তার ছোটবেলার, গ্রামের পুরোনো দিনের, আর হারিয়ে যাওয়া মানুষের গল্প।

রাহুল মন দিয়ে শুনত। কখনো জিজ্ঞেস করত,

— "দিদিমা, তুমি একা থাকতে ভয় পাও না?"

তানু মৃদু হেসে বলত,

— "ভয় তো পাই, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে।"

দিন যায়। মাস যায়। রাহুলের উপস্থিতিতে দত্তবাড়িতে আবার হাসি ফেরে। তানু বিকেলের আলোয় আর শুধু স্মৃতি খোঁজে না—সে অপেক্ষা করে রাহুলের জন্য।

একদিন বিকেলে রাহুল এল না। পরের দিনও না। তৃতীয় দিন তানু নিজে খোঁজ নিতে গেল। জানতে পারল, রাহুলের বাবা শহরে কাজ পেয়েছেন, পুরো পরিবার চলে গেছে।

তানু কিছু বলল না। শুধু বাড়ি ফিরে এসে বারান্দায় বসে রইল। সূর্য ডুবছিল। আজ আলোটা যেন একটু বেশি নিস্তেজ।

সেই রাতেই বড় ছেলের ফোন এল। অনেকদিন পর।

— "মা, কেমন আছ?"

তানু একটু চুপ করে থেকে বলল,

— "ভালোই আছি রে।"

ছেলে বলল,

— "মা, ভাবছি তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে যাব।"

তানুর চোখে জল এল। সে জানালার বাইরে তাকাল। আমগাছটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। রাহুলের হাসি, বিকেলের আলো, গল্প—সব একসঙ্গে মনে পড়ে গেল।

— "দেখি," তানু বলল, "একটু সময় দে।"

ফোন কেটে গেল। তানু জানে, সে যাবে। একদিন না একদিন। কিন্তু আজ সে বারান্দায় বসে শেষ বিকেলের আলোটা উপভোগ করতে চায়।কারণ আলো ডুবে গেলে যেমন রাত আসে, তেমনি প্রতিটা বিদায়ের মধ্যেই থাকে নতুন শুরু। আর তানু, সে সেটা বুঝে গেছে অনেক আগেই।

প্রিয়দর্শিনী

(মুরাদ রিজভি, ব্যাচ ৬, DTE)

স্বাধীনতা কী প্রিয়দর্শিনী?
যেখানে তুমি চলো নিজের মন মতো!! নাকি এক অদ্ভূত দুনিয়া!!

যেখানে গোধূলি বিকাল এ এসেছো দমকা হাওয়াই,
খোলা চুল উড়ছে তোমার!
ফুলের সমাহার এ এক জীবন্ত ফুল, রঙিন মলিন হাসছে!!
জানি আমি তা সামনে দেখার স্বাধীনতা নেই।
তাই চুপিসারে দেখছি নিঃস্তব্ধতার আড়ালে।
স্বাধীনতা মানে কী সময়ের সাথে বয়ে চলা?? যেখানে নানা ইতিহাস গড়তে হবে বুঝি!! তোমার জন্য এ প্রতিযোগিতার আধুনিক শহরে কী ইতিহাস গড়বো আমি!!
আমার জানা নেই, জানি শুধু এই ছোট পৃথিবীতে তোমার জন্য এক টুকরো স্বাধীনতা দিতে পারবো।
যাতে কেউ তোমায় ক্রিটিসাইজ করতে পারবে না, শুধু নিজের মন খুলে উড়বে। যা খুশি করবে!!
এমন স্বাধীনতা কী আমাদের দেশের মেয়েরা পেয়েছে?
সবাই বলে বেশি স্বাধীনতা দেওয়া নাকি মন্দ!!
আমার জানা নেই!
শুধু জানি তোমাকে স্বাধীনতার চিঠি দিতে পারলে আমি যে দিব্যি খুশি।

শুভ বসন্ত প্রিয়দর্শিনী
স্বাধীনতার স্বাদ কী পেলে?
নাকি বসন্তের হাওয়াই মেতেছো নিজের আনমনে!!
যেনো বসন্তের হাওয়া বইছে
ফাগুনের ছোঁয়া লাগবে তোমার আনমনে!
বয়ে যাবে সময়
আমি যে চুপিসারে থাকবো তোমার সাথে বহুক্ষণে
তোমাকে ছাড়তে দিবো না কখনো হাল!
নিজে হেরে গিয়েও জিতিয়ে তোমাকে দিতে চাই বসন্তের হাওয়ার মতো।

এই নিশি রাতে কী স্বাধীনতা পেয়েছো??

যেখানে তুমি হালকা বাতাসে নিজেকে ভাসাতে পারছো,
আমি চুপিসারে
দেখবো সেই ছন্দখেলা।
যেনো জোছনার আলো চারদিকে জ্বলজ্বল করছে
তুমি কী তা দেখতে পেয়েছিলা??
জানি না! তবে আমি মনে হয় দেখতে পেয়েছি!!
যেনো সেই চিরচেনা রুপে তুমি ফিরেছো ,,,,
আজ আর না বলি কিছু!

প্রিয়দর্শিনী স্বাধীনতা না পেয়ে,
তুমি এই অবেলায় কোথায় হারিয়ে গেলে,
আমি যে তোমাকে মরীচিকার মতো খুঁজছি!
তাই বারবার তোমাকে ডাকছি এই তীরে,
তোমাকে একবার দেখবো বলে, তোমার মনের খবর জানবো বলে।
বলেছিলে সুস্থ হলে বলবে সব, সেই অপেক্ষায় আজও বসে আছি।
কেমনে কাটবে আমার দিন তোমার সাথে সাক্ষাৎ না করে!
জানি না, তবুও ছুটছি তোমার পিছু অনেক বছর ধরে।
স্বাধীনতা কী পাওয়া যায়? আমি যে এতো বছর ধরে ছুটছি!!

প্রিয়দর্শিনী তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ!
তুমি যেনো কাঠগোলাপ এর সাদার মায়া কিন্ত লুকিয়ে আছে তোমার অনেক কষ্ট।

যা তুমি আমাকে বলো না সহজে!
আমি তোমার পিছনে ছায়ার মতো আছি,, রোদ,বৃষ্টি কোন কিছুই যাতে তোমাকে অসুস্থ না করে।
তোমার হাসি যেনো গহীনের নীরবতা,, যা করে আমাকে মুগ্ধ!
তাই বারবার খুঁজে বেড়াই তোমাকে।
তবুও কী তুমি বন্দী মনে করছিলে? আমি যে তোমাকে স্বাধীনতা উপলব্ধি করানোর জন্য তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছি অন্ধকার থেকে।

আবারো চলে আসলো শীত
তবুও কী তুমি স্বাধীনতা পেয়েছো??

নাকি ডিসেম্বর শহরে এসেছিলে তুমি,
স্মৃতিচারণ করতে ক্ষণিকের জন্য।
হালকা শীত মাঝে রোদ তুমি নীরবে
চলছো আপন মনে, আমায় তুমি দেখলে না!
আমি যে তোমার পাশে সবসময় ভনভন করেছিলাম
তুমি তা দেখলে না!

স্বাধীনতা এমনই পাশে থাকে শুধু তুমি দেখতে পাও না!
যেদিন দেখা শুরু করবে পাবে এক নতুন স্বাধীনতা।

টেক্সটাইল শিল্প: শুরু থেকে আধুনিক প্রযুক্তির যাত্রা

(মোজাহিদ হোসাইন মজুমদার, ব্যাচ ৭, DTE)

আদিম যুগে বস্ত্রের ব্যবহার: মানব সভ্যতার সূচনালগ্নে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই জীবন ধারণ করত। তখন শরীর রক্ষার প্রধান উপায় ছিল পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল ও লতা। আবহাওয়ার প্রভাব থেকে বাঁচতে এবং শরীর ঢাকতে এসব উপকরণ ব্যবহার করা হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার করে যে তুলা, পাট, পশুর লোম ও উদ্ভিজ্জ আঁশ পাকিয়ে সুতা বানানো যায়। খুব সাধারণ হাতচালিত যন্ত্র, যেমন কাঠের ফ্রেম বা পাথরের সাহায্যে কাপড় বোনা শুরু হয়। এই পর্যায়েই টেক্সটাইল শিল্পের বীজ রোপিত হয়।

প্রাচীন সভ্যতায় টেক্সটাইল শিল্প: প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে টেক্সটাইল শিল্প শুধু ব্যবহারিক নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মিশরে লিনেন কাপড় গরম আবহাওয়ার জন্য উপযোগী ছিল এবং ধর্মীয় আচারেও ব্যবহৃত হতো। সিন্ধু সভ্যতায় তুলা চাষ, সুতা কাটা ও কাপড় বোনার উন্নত কৌশল দেখা যায়। চীনে সিল্ক উৎপাদন ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত শিল্প। এই সময় কাপড় মানুষের সামাজিক অবস্থান, পেশা ও শ্রেণি বোঝানোর মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

মধ্যযুগে টেক্সটাইলের বিস্তার: মধ্যযুগে টেক্সটাইল শিল্প আরও সংগঠিত ও বৈচিত্র্যময় হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মসলিন ও জামদানি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও হালকা, যা ইউরোপীয় বাজারে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করে। এসব কাপড় তৈরিতে প্রচুর সময় ও দক্ষতা প্রয়োজন হতো। ইউরোপে উল ও লিনেন শিল্প স্থানীয় অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। এই সময় গিল্ড সিস্টেম চালু হয়, যেখানে কারিগররা সংগঠিতভাবে কাজ করত।

শিল্প বিপ্লব ও যান্ত্রিক টেক্সটাইল: ১৮শ শতকের শিল্প বিপ্লব টেক্সটাইল শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। মেশিনের মাধ্যমে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্পিনিং জেনি ও পাওয়ার লুম শ্রম নির্ভরতা কমিয়ে আনে এবং শিল্পকে কারখানাভিত্তিক করে তোলে। এতে কাপড় সস্তা ও সহজলভ্য হয়, তবে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আধুনিক টেক্সটাইল প্রযুক্তি ও মেশিন: বর্তমানে টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক মেশিন ও অটোমেশন সিস্টেম। Air Jet Loom বাতাসের প্রবাহ ব্যবহার করে সুতা চালনা করে, ফলে উৎপাদন গতি অত্যন্ত বেশি হয়। Water Jet Loom পানি ব্যবহার করে হালকা ফাইবার বোনে। এসব প্রযুক্তির ফলে কাপড়ের গুণগত মান উন্নত হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে আসে। একই সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজাইন ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে।

আধুনিক ফাইবার ও স্মার্ট ম্যাটেরিয়াল:আজকের টেক্সটাইল শিল্পে শুধু তুলা বা উলের ওপর নির্ভরতা নেই। কেভলার, নোমেক্স, কার্বন ফাইবারের মতো উন্নত ফাইবার ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব ফাইবার অত্যন্ত শক্তিশালী, তাপসহনশীল ও দীর্ঘস্থায়ী। ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে কাপড়ে পানি প্রতিরোধ, দাগ প্রতিরোধ ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য যোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

আধুনিক টেক্সটাইল প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত পোশাক

ফায়ারপ্রুফ সুট (Fire-Resistant Clothing): ফায়ারপ্রুফ পোশাক এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে উচ্চ তাপমাত্রা ও আগুনের সংস্পর্শে এসেও সহজে পুড়ে না যায় এবং শরীরকে নিরাপদ রাখে। এই পোশাকগুলো মূলত ফায়ার ফাইটার, তেল-গ্যাস শিল্পের কর্মী, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ভারী শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয়।এই ধরনের পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত প্রধান ফাইবারগুলো হলো Nomex, Kevlar, PBI (Polybenzimidazole) এবং Modacrylic।
Nomex ফাইবার স্বাভাবিকভাবেই আগুন প্রতিরোধী এবং উচ্চ তাপে গলে যায় না। Kevlar আগুন প্রতিরোধের পাশাপাশি অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় পোশাককে টেকসই করে। PBI ফাইবার খুব উচ্চ তাপমাত্রাতেও তার গঠন বজায় রাখতে পারে, তাই এটি সবচেয়ে উন্নত ফায়ারপ্রুফ পোশাকে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় এসব ফাইবার মিশিয়ে ব্লেন্ড ফ্যাব্রিক তৈরি করা হয়।

বুলেটপ্রুফ সুট ও বডি আর্মার: বুলেটপ্রুফ পোশাক আধুনিক টেক্সটাইল শিল্পের একটি বড় সাফল্য। এই পোশাক সরাসরি গুলি থামানোর বদলে গুলির শক্তি শোষণ করে শরীরকে রক্ষা করে। সেনাবাহিনী, পুলিশ, নিরাপত্তাকর্মী এবং বিশেষ বাহিনী এসব পোশাক ব্যবহার করে।বুলেটপ্রুফ সুট তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ফাইবার হলো Kevlar, Twaron, Dyneema (UHMWPE) এবং Spectra।
Kevlar ও Twaron অ্যারামিড ফাইবার, যেগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং টান সহ্য করতে পারে। Dyneema হলো Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, যা স্টিলের চেয়েও শক্ত কিন্তু ওজনে খুব হালকা। এই ফাইবারগুলো বহু স্তরে সাজিয়ে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট তৈরি করা হয়।
এয়ারোস্পেস ও স্পেস স্যুটটেক্সটাইল: এয়ারোস্পেস খাতে ব্যবহৃত পোশাক ও টেক্সটাইল সাধারণ কাপড়ের মতো নয়। স্পেস স্যুটকে মহাকাশের প্রচণ্ড ঠান্ডা-গরম, শূন্য বায়ুচাপ এবং রেডিয়েশন থেকে শরীরকে রক্ষা করতে হয়।এই ধরনের স্যুট তৈরিতে ব্যবহৃত ফাইবারগুলোর মধ্যে রয়েছে Nomex,Kevlar, Teflon-coated fiberglass, Neoprene এবং Polyurethane-based fabrics।Nomex ও Kevlar তাপ ও আগুন প্রতিরোধ করে, Teflon-coated ফাইবার রেডিয়েশন ও রাসায়নিক প্রতিরোধে সাহায্য করে। একাধিক স্তরের টেক্সটাইল ব্যবহার করে স্পেস স্যুট তৈরি করা হয়, যেখানে প্রতিটা স্তরের আলাদা আলাদা কাজ থাকে।

কেমিক্যাল প্রোটেকটিভ সুট: রাসায়নিক শিল্প, ল্যাবরেটরি এবং বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা কর্মীদের জন্য কেমিক্যাল প্রোটেকটিভ পোশাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পোশাক শরীরকে বিষাক্ত গ্যাস, তরল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক থেকে সুরক্ষা দেয়।এই সুটগুলো সাধারণত PTFE (Polytetrafluoroethylene), PVC, Neoprene, Tyvek (HDPE fiber) এবং Butyl Rubber-coated fabric দিয়ে তৈরি হয়।Tyvek খুব হালকা কিন্তু কেমিক্যাল প্রতিরোধে কার্যকর। PTFE ও Neoprene রাসায়নিক শোষণ হতে বাধা দেয়, ফলে শরীর নিরাপদ থাকে।

হিট রেজিস্ট্যান্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুট : উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশ যেমন ফাউন্ড্রি, স্টিল মিল বা গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত পোশাককে অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে হয়। এই পোশাক শ্রমিকদের দেহকে তাপজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।এই ধরনের পোশাক তৈরিতে Aluminized Fiberglass, Carbon Fiber, Kevlar এবং Pre-oxidized Acrylic fiber ব্যবহার করা হয়। Aluminized ফ্যাব্রিক তাপ প্রতিফলন করে, ফলে শরীরে তাপ কম পৌঁছায়।

স্মার্ট টেক্সটাইল ও ওয়্যারেবল স্যুট : আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজনে তৈরি স্মার্ট টেক্সটাইল ভবিষ্যতের পোশাক হিসেবে বিবেচিত। এইপোশাকে সেন্সর, কন্ডাকটিভ ফাইবার এবং ইলেকট্রনিক উপাদান যুক্ত থাকে।এই পোশাকে ব্যবহৃত ফাইবারগুলোর মধ্যে রয়েছে Conductive Polyester, Silver-coated nylon, Car-

bon nanotube yarn।
এসব ফাইবার শরীরের তাপমাত্রা, হার্টবিট ও নড়াচড়া পর্যবেক্ষণে সক্ষম।

কেউ কেউ ফেরে

(মো. হাসিবুল হাসান, প্রভাষক, DTE)

"আপনার হাসিটা অনেক সুন্দর" টানা কয়েকদিন ধরে এ মেসেজটা ফেসবুক ফ্রেন্ডলিস্টে না থাকা এক অপরিচিত আইডি থেকে পেতে পেতে গতকাল রাতে কি জানি এক কৌতূহল নিয়ে সে আইডির মেসেজ রিকুয়েষ্ট অ্যাক্সেপ্ট করলো শ্রেয়া। এরপর ছোট করে একটা মেসেজ লিখলো কিছুটা এরকম, " প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ, আমার বন্ধু-বান্ধবও তাই বলে। তবে কে আপনি?" অনেকক্ষণ পার হয়ে যাওয়ার পরও কোনো উত্তর না পেয়ে শ্রেয়া বুঝে নিলো রাত তো কম হয়নি, লোকটি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা হ্যা, লোকটি কিভাবে বললাম তার কাহিনী তো বলা হলো না। মেসেজ দেয়ার আগে, শ্রেয়া ঐ আইডিটা ঘুরে দেখে এসেছে। লোকটির নাম রাজীব হাসান, ভদ্রলোক পেশায় একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, সদ্য পাশ করা, সুশ্রী লোকটিকে ইন্জিনিয়ারিং ভার্সিটি ৪র্থ বর্ষে থাকা শ্রেয়ার কাছে সমীহ জাগানিয়াই মনে হলো। তা না হলে যে আইডিটা মেসেজ রিকুয়েষ্ট বক্সেই পড়ে থাকতো তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সুন্দরী, হরেক গুণে গুণান্বিত শ্রেয়ার মেসেজ বক্সে তো আর এমন হুট করে মেসেজ দেয়া মানুষের কমতি নেই। পরদিন সকাল বেলা ক্লাসের উদ্দেশ্য বেড়িয়ে পড়ে সে, সারাদিন নানা কাজের চাপে আর অনলাইনে আসা হয়নি। বিকেলে বাসায় ফিরে মেসেঞ্জারে ঢুকতেই দেখলো রাজীব হাসান নামের লোকটি রিপ্লাই দিয়ে রেখেছে, "সবাই তো আর এমনি আপনাকে সুন্দর বলে না, অবশ্যই কারণ আছে। আর আমি এক নগন্য লোক, আমার পরিচয় জেনে কি করবেন!" বেশ মজা পেলো শ্রেয়া মেসেজটা দেখে, তখন সেও জবাবে বললো, " মনোবিজ্ঞান এর তুখোড় ছাত্র এ কথা বললেই হবে নাকি! " "আপনি তাহলে আমার প্রোফাইল ঘেঁটে দেখে ফেলেছেন! " মেসেজে রাজীবের এমন উত্তরে খানিকটা লজ্জা পেলেও শ্রেয়া তা বুঝতে দিলো না। এরপর থেকে তাদের নিয়মিত কথা হতো, রাজীব খুব গুছিয়ে কথা বলতে জানতো, ফলে অল্প কয়েকদিনেই সে শ্রেয়ার মনে নিজের জায়গা করে নিলো। রাজীব খুব সুন্দর করে শ্রেয়ার প্রশংসা করতো, তার ড্রেসআপ, তার হাসি, তার বুদ্ধি-সবকিছুর। মাঝে মাঝে রাজীব বলতো, " তোমার হাসিটা দেখলে মনে হয় দুনিয়ার সব সুখ ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ।"

সপ্তাহ দুয়েক বাদে রাজীবই শ্রেয়াকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাসার সামনের গলি থেকে। অনেক ঘুরে, তারা "North End " এর গুলশান শাখায় গিয়ে বসলো। রাজীব, শ্রেয়ার থেকে তার পছন্দের ফ্লেভারের কথা জেনে অর্ডার করে এসে বসে গল্প শুরু করলো। একথা, ওকথায় রাজীব বেশ ভালো করেই শ্রেয়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে সে পছন্দ করে তাকে, শ্রেয়াও বুঝতে পেরে মিটিমিটি হেসে উঠছিল বারবার। যাক, সেদিন, অনেক বেলা পর্যন্ত গল্প করলো তারা, তেমনটাই মনে হয়েছিল শ্রেয়ার। তো, দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে শ্রেয়া ৮টা নাগাদ বের হয়ে যাওয়ার তাড়া দেয়ায় রাজীবও বসে থাকার জন্যে আর জোর করেনি। ফেরার পথে একদম চুপচাপ হয়ে গেলো রাজীব, যেনো কেউ জোর করে মুখে টেপ মেরে দিয়ে গেছে। রাজীবকে চুপ থাকতে দেখে শ্রেয়াও আর কথা আগায়নি, তবে এতটুকু বুঝতে পেরেছিল, এ ছেলের প্রেমে পড়ে গেছে সে, রাজীব যদি সরাসরি প্রস্তাব দেয়, তবে তা ফিরিয়ে দেয়ার সাধ্যি নেই তার।

বাসার গলিতে নামিয়ে দেয়ার সময় রাজীব ঠিক ঠিকই শ্রেয়াকে প্রশ্ন করে বসে," আমাকে কি তোমার ভালো লাগে?" শ্রেয়া চমকে উঠে বলে, "বুঝতে পারলাম না! " রাজীব তখন তার মনের কথা সব খুলে বলে, শেষে জিজ্ঞেস করে, "সারাজীবন আমার পাশে চলার জন্য পাবো কি তোমায়?"। "পাবেন হয়তো" বলে, মুচকি হেসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে শ্রেয়া। রাজীবও তখন যা বুঝার বুঝে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়িটা তাকে পার করে সামনে যাওয়ার সময় হটাৎ শুনতে পায় শ্রেয়া, গাড়ি

থেকে মনে হয় রাজীব বলে উঠলো," এ নিয়ে ১১", কথাটা বলার সময় চিরচেনা রাজীবের গলাটা কেমন যেন ঠাণ্ডা, অনুভূতিহীন লাগলো তার কাছে। তবে, মনের ভুল ভেবে বিষয়টাকে পাত্তা না দেয়া শ্রেয়া কথাটার নিষ্ঠুর সত্যতার পরিচয় পেলো সপ্তাহখানেক পর যখন হাতে করার মত কিছুই ছিলো না বলে মনে হয়েছিলো আদতে....

(চলবে)

"গ্রিন ইজ দ্য নিউ ব্ল্যাক"
বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের সবুজ বিপ্লব

(সানজানা আফরিন বৃষ্টি, ব্যাচ ১১, DTE)

রংধনুর সব রং মিলিয়ে যাকে আমরা 'নতুন কালো' বলছি, তা আজ আর শুধু ফ্যাশনের ট্রেন্ড নয়- একটি অস্তিত্বের দর্শন । বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্প, যার হাত ধরে বিশ্বের ফ্যাশন র‍্যাম্পে উঠছে অসংখ্য পোশাক, আজ নিজেই এক অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সাক্ষী । এই বিপ্লবের নাম টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন । একটি কালো সত্য থেকে সবুজের যাত্রা

বাংলাদেশ দীর্ঘকাল 'বিশ্বের পোশাক কারখানা' হিসাবে পরিচিত । কিন্তু এই খ্যাতির আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক কঠিন সত্য: টেক্সটাইল শিল্প বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জল দূষণকারী । এক জিন্স রাঙাতে খরচ হয় প্রায় ১০,০০০ লিটার পানি । এক কিলোগ্রাম কাপড় রঙ করতে লাগে ১০০-১৫০ লিটার পানি । এই সংখ্যাগুলো যেন আমাদের বিবেকের উপর চাপ দিত । কিন্তু বাংলাদেশের দূরদর্শী কারখানাগুলো সেই সংখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করছে । তারা বলছে, "না, এমন নয়। আমরা পরিবর্তন আনবো" ।
ওজোন ওয়াশিং: জাদুকরী বাতাসের খেলা

ঐতিহ্যবাহী ওয়াশিংয়ে পাথর, রাসায়নিক, অগাধ পানি- এই সবকিছুর প্রয়োজন হয় । কিন্তু ওজোন ওয়াশিং প্রযুক্তি এসে বলছে, "কিছুই লাগবে না, শুধু দিন আমাকে কিছু সময় আর একটু বাতাস" । ওজোন গ্যাস CO_3 একটি শক্তিশালী অক্সিডাইজিং এজেন্ট । এটি যখন ডেনিম বা কাপড়ের সংস্পর্শে আসে, তখন প্রাকৃতিকভাবেই ফ্যাব্রিক থেকে ইন্ডিগো রংকে আলাদা করে ফেলে, ভিনটেজ লুক তৈরি করে ।
ফলস্বরূপ: পানির ব্যবহার কমে ৮০-৯০% রাসায়নিকের প্রয়োজনীয়তা প্রায় শূন্যের কোটায় সময় বাঁচে ৬০% শক্তি সাশ্রয় হয় ৫০% পর্যন্ত এটি যেন কাপড়কে প্রাকৃতিক উপায়ে 'বার্ধক্য' দান করা । রাম্পাল, ডিআরডব্লিউ, নিশাত গার্মেন্টসের মতো শ্রেষ্ঠ কারখানাগুলো এই প্রযুক্তিকে তাদের উৎপাদনের অংশ করে ফেলেছে ।
ওয়াটারলেস ডাইং: যেখানে পানির স্থানে কার্বন ডাই-অক্সাইড রাজত্ব করে

যদি বলি, এখন কাপড় রং হয় পানিতে নয়, বরং... গ্যাসে? অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই বাস্তবতা । সুপারক্রিটিকাল CO_2 ডাইং প্রযুক্তিতে তরল-গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইডই হয় রং করার মাধ্যম ।
প্রক্রিয়াটি যাদুর মতো:

CO_2 গ্যাসকে উচ্চচাপে একটি বিশেষ চেম্বারে নেওয়া হয় ।এখানে এটি হয়ে ওঠে সুপারক্রিটিকাল ফ্লুইড-নতুন এক অবস্থা।এই ফ্লুইডে রং গুলে ফ্যাব্রিকের ভিতরে প্রবেশ করে ।কাজ শেষে চাপ কমিয়ে দিলেই CO_2 গ্যাস হয়ে উড়ে যায়, রং থেকে যায় ফ্যাব্রিকে ।

লাভগুলো অসাধারণ: শূন্য বর্জ্য পানি ৯৫% কম শক্তি ব্যবহার ১০০% রং শোষণ (কোনও অপচয় নেই) সময় সাশ্রয় ৫০% বাংলাদেশের কিছু অগ্রণী কারখানা ইতিমধ্যে এই উচ্চ বিনিয়োগের প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা করছে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ।
ন্যানো-বাবল টেকনোলজি: ক্ষুদ্র ফুসফুসে বিশাল পরিবর্তন একটি নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে ন্যানোবাবল টেকনোলজি । এতে অতি ক্ষুদ্র, খালি চোখে অদৃশ্য বুদ্বুদ তৈরি করে সেগুলোকে বৈদ্যুতিক চার্জ দেওয়া হয় । এই বুদবুদগুলো রংয়ের অণুগুলিকে আকর্ষণ করে এবং ফ্যাব্রিকের গভীরে নিয়ে যায় অসাধারণ দক্ষতায় । পানির প্রয়োজন কমে

যায় প্রায় অর্ধেক, রাসায়নিকের ব্যবহারও কমে ব্যাপক হারে ।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা: সবুজ পথের দুর্গমতা এই সবুজ যাত্রা মসৃন নয় । আধুনিক প্রযুক্তির ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি, কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, এবং পুরনো অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসা-সবই চ্যালেঞ্জ । কিন্তু বাংলাদেশের কারখানাগুলো বুঝতে পেরেছে, এটি বিলাসিতা নয়, বেঁচে থাকার প্রয়োজন । বিশ্ববাজারে 'গ্রিন ট্যাগ' ছাড়া আজ ব্যবসা প্রায় অসম্ভব । ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'গ্রিন ডিল' বা আমেরিকার পরিবেশবান্ধব নীতি আমাদের শিল্পকে টেকসই হতেই বাধ্য করছে ।

শেষ কথা: যে সূতা বোনে ভবিষ্যত যখন একটি কারখানায় ওয়াটারলেস ডাইং মেশিন চালু হয়, বা যখন একটি ওজোন ওয়াশিং ইউনিট পানির পাইপের বদলে কেবল একটি বিদ্যুৎ সংযোগ চায়-সেই মুহূর্তে শুধু একটি জিনিস তৈরি হয় না । তৈরি হয় একটি নতুন নৈতিকতা, একটি প্রতিশ্রুতি । বাংলাদেশের টেক্সটাইল আজ শুধু 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগ নয়, বরং 'গ্রিনলি মেইড ইন বাংলাদেশ'-এই ব্র্যান্ডিং এর দিকে এগোচ্ছে ।

ফ্যাশনের দুনিয়ায় স্টাইল অফিসার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এখন গুরুত্বপূর্ণ 'সাসটেইনেবিলিটি অফিসার' । আজ 'গ্রিন' শুধু ট্রেন্ড নয়, বিবেক । আর বাংলাদেশের এই সবুজ বিপ্লব শুধু ব্যবসা নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের একটি দায়মুক্তির চিঠি । আমাদের নদী, আমাদের পৃথিবী, এবং আমাদের বিবেক-সবাই যেন একসাথে বলে উঠে: "হ্যাঁ, গ্রিন ইজ দ্য ট্রু নিউ ব্ল্যাক"

আগন্তুক

(মো. ওমর হাসান, ব্যাচ ৭, DTE)

এই ইট পাথরের শহরে আমি এক আগন্তুক
শুনেছিলাম এই শহর নাকি জাদুর শহর!
ধূলিকণার মত স্বপ্ন উড়ে বাতাসে–
কারও বা জীবিকার তাগিদ কারও বা ক্ষুধার তাড়না।
পথে হাটতে হাটতে শুনতে পেলাম বটবৃক্ষের কান্না–
করুন সুরে সে বললো এই শহর নিছক মোহমায়ায় ঘেরা,
এই শহর মানুষকে মানুষ নয় রাক্ষস বানায়।
আমি জানতে চাইলে সে বললো–
এই শহরের প্রধান জ্বালানি একটি কাগজ মাত্র।
এর এতই শক্তি যা ভাই ভাই এর সম্পর্ক ছিন্ন করে,
যা গরিবের হক কাড়ে একই সাথে কোষ্ঠাসা করে রাখে একটি জাতি।
আমি এর সমাধান চাইলে সে বললো
মানুষ হয়ে মানুষের সুখ যদি দেখতে না পারো,
অভাবীর একবেলার আহারদাতা না হতে পারো,
গরীবের হক মেরে খাও তবে যেন রাখো–
তোমার স্থান হবে আমার মতই এই করুন নেক্রোপলিসে

Bangladesh Textile Industry: From Fiber to Fashion;

The Role of Engineering and Merchandising Excellence

(Jaglul Haque Mridha, Assistant Professor and Head, Department of AMM)

Bangladesh has emerged as one of the most significant players in the global textile and apparel industry. From humble beginnings to becoming the world's second-largest exporter of ready-made garments (RMG), the country's journey is deeply rooted in its strength in textile engineering, fiber utilization, and efficient apparel merchandising. Today, Bangladesh's textile sector is not only a backbone of the national economy but also a living example of how technical knowledge and management expertise can work together to create global success.

Textile Fibers: The Foundation of Bangladesh's Strength

Textile fibers form the foundation of any textile and apparel industry, and Bangladesh has built a strong position primarily based on cotton fibers. Although the country depends largely on imported cotton, Bangladeshi textile mills have developed remarkable expertise in cotton processing, spinning, knitting, and weaving. This technical efficiency allows manufacturers to produce high-quality yarns and fabrics that meet the demanding standards of international buyers.

In addition to cotton, the use of man-made fibers such as polyester, viscose, spandex (elastane), and blends has increased significantly over the last decade. The growing demand for stretch, comfort, durability, and performance wear has made fibers like spandex highly relevant in modern apparel production. Bangladeshi textile engineers are now working extensively with blended fabrics—such as cotton-spandex, polyester-viscose, and functional textile materials—to cater to global fashion trends.

The gradual diversification from traditional cotton-based products to value-added fiber blends indicates a positive transformation. It reflects how Bangladesh is moving from basic apparel production toward more technically advanced and fashion-oriented textiles.

Textile Engineering: Driving Innovation and Quality

Textile engineering plays a crucial role in sustaining and improving the competitiveness of Bangladesh's textile industry. Engineers are involved in every stage of production—from fiber selection and yarn engineering to fabric development, dyeing, finishing, and quality control. Their role has become even more important as buyers now demand not only cost efficiency but also sustainability, compliance, and innovation.

Modern Bangladeshi textile mills are increasingly equipped with advanced machinery, automation, and digital monitoring systems. Textile engineers ensure optimum utilization of these technologies to reduce waste, improve productivity, and maintain consistent quality. Sustainable practices such as water-efficient dyeing, energy-saving processes, and eco-friendly finishes are now integral parts of textile engineering decisions.

Furthermore, research and development in fabric engineering—such as moisture management, stretch recovery, wrinkle resistance, and comfort enhancement—has opened new oppor-

tunities for Bangladesh in sportswear, activewear, and smart textiles.

The RMG Sector: Backbone of the National Economy

The Ready-Made Garment (RMG) sector is the most visible and influential segment of Bangladesh's textile industry. It contributes more than 80% of the country's export earnings and employs millions of workers, especially women. The success of the RMG sector is directly linked to the efficiency of the textile value chain, from fiber and fabric production to final garment delivery.

Bangladesh's RMG industry is known globally for its large-scale production capability, competitive pricing, and improving compliance standards. Over the years, the industry has made significant progress in workplace safety, ethical manufacturing, and environmental sustainability. Today, Bangladesh hosts some of the world's highest-rated green garment factories, which reflects a strong commitment to responsible production.

However, the future of the RMG sector depends on moving beyond basic products and focusing on higher value-added garments, diversified fibers, and innovative designs. This shift requires close collaboration between textile engineers, designers, and merchandising professionals.

Apparel Merchandising: Bridging Market and Manufacturing

Apparel merchandising acts as the bridge between global buyers and manufacturing units. In Bangladesh, merchandising has evolved from a basic order-following role to a strategic function that directly influences profitability, customer satisfaction, and brand reputation.

Merchandisers today must possess strong knowledge of textiles, fibers, costing, production planning, quality standards, and international trade practices. Understanding fabric behavior, fiber characteristics, and garment construction helps merchandisers communicate effectively with both buyers and production teams. This technical understanding reduces errors, shortens lead time, and ensures smoother execution of orders.

In the highly competitive global apparel market, successful merchandising also depends on trend analysis, product development, and sustainability awareness. Bangladeshi merchandisers now play an active role in suggesting fabric options, sustainable materials, and cost-effective solutions to buyers, rather than simply receiving instructions.

Integration of Engineering and Merchandising

The real strength of Bangladesh's textile and apparel industry lies in the integration of textile engineering and apparel merchandising. When engineers and merchandisers work collaboratively, the result is efficient production, reduced wastage, better quality, and stronger buyer relationships.

For example, the selection of appropriate fibers and fabrics at the development stage—guided by both technical feasibility and market demand—can significantly improve order success. Engineers ensure technical performance, while merchandisers ensure commercial viability. This integrated approach is essential for Bangladesh to compete with emerging textile-producing countries.

Future Outlook and Role of Education

The future of Bangladesh's textile and RMG industry depends heavily on skilled human resources. Educational institutions, especially textile engineering and apparel management departments, play a vital role in preparing future professionals. Updated curricula, industry-ori-

ented training, research activities, and collaboration with factories are essential to meet upcoming challenges.

As global fashion shifts toward sustainability, innovation, and speed, Bangladesh must continue investing in advanced fibers, technical textiles, smart manufacturing, and professional merchandising practices. With strong academic leadership, skilled engineers, and capable merchandisers, the country is well-positioned to maintain and enhance its global standing.

Bangladesh's textile industry is a remarkable example of how fiber expertise, engineering excellence, and merchandising efficiency can collectively drive national development. From fiber to fashion, every stage of the value chain reflects the dedication and potential of textile professionals. By embracing innovation, sustainability, and integrated knowledge, Bangladesh can confidently move toward a more value-driven and resilient textile future.

বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড সময় ও স্বাচ্ছন্দ্যের বন্ধন

(মারিয়া কিবতিয়া, ব্যাচ ৮, DTE)

ভূমিকা

ফ্যাশন কেবল পোশাক পরিধানকেই বোঝায় না,এটি সময়, সমাজ ও সমাজের মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন। প্রতি যুগে যুগে ফ্যাশনের ধারা পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের জীবনযাপন, প্রয়োজন এবং প্রযুক্তির সাথে মিল রেখে। বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ডেও রয়েছে আধুনিকতা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরার এক অনন্য মিলন; যা আগের তুলনায় অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান ফ্যাশনের মূল নির্দেশনা -
বর্তমান সময়ে ফ্যাশনে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে 'কমফোর্ট' ও 'ব্যবহারিকতা'। অতিরিক্ত জাঁকজমকপূর্ণ ডিজাইনের পরিবর্তে মানুষ এখন সহজ, আরামদায়ক পোশাকের দিকে ঝুঁকছে কিন্তু সেটা হতে হবে রুচিশীল।লুজ কিংবা ওভার সাইজড্ পোশাক কিংবা জেন্ডার-নিউট্রাল ফ্যাশনই বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়।

ফ্যাব্রিক ও উপকরণের পরিবর্তন -
এখনকার ফ্যাশন ট্রেন্ডে বড় ভূমিকা পালন করছে ফ্যাব্রিক । বর্তমানে কটন, লিনেন বা মসলিনের মতো প্রাকৃতিক ও বাতাস চলাচলে সক্ষম এমন সব ফ্যাব্রিকের চাহিদা বেড়েছে। আরাম ও টেকসই এর জন্য
ব্লেন্ডেড ফ্যাব্রিক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

রঙ ও ডিজাইনে আধুনিকতা -
বর্তমান ফ্যাশনে *আর্থ টোন*, *প্যাস্টেল* এবং *নিউট্রাল শেডগুলো* বেশ চাহিদায় রয়েছে। একই সাথে ছোট ছোট প্রিন্ট অথবা মিনিমাল ডিজাইন, কি বোল্ড অর্থাত অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন ও শামিল রয়েছে। বাংলার ঐতিহ্য নকশিকাঁথা বা জামদানি - এগুলোর মোটিফে রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব -
সামাজিক মাধ্যম্যের বদৌলতে ফ্যাশন ট্রেন্ড শুধু দেশ, জাতি, বর্ণতেই সীমাবদ্ধ থাকে না এখন। ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট কিংবা সে যেকোনো সামাজিক মাধ্যমে যেকোনো নিত্য নতুন ট্রেন্ড কয়েক সেকেন্ডেই ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ডিজাইনার ছাড়াও সাধারণ মানুষ ও এখন ট্রেন্ডের অংশীদার হচ্ছে।

সাসটেইনেবল ফ্যাশনের গুরুত্ব -
"সাসটেইনেবল বা দায়িত্বশীল ফ্যাশন "- একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা ফ্যাশন জগতে। মানুষ এখন পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত উৎপাদনের নেতিবাচক প্রভাব, টেক্সটাইল ওয়েস্ট ইত্যাদি নিয়ে সচেতন হচ্ছে। যার ফলসরূপ ইকো-ফ্রেন্ডলি ফ্যাব্রিক, রি-ইউজ, রি-সাইকেল ধারণাগুলো ফ্যাশন জগতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

উপসংহার -

বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড শুধুমাত্র কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা না, এটি স্বাচ্ছন্দ্য, সচেতনতার প্রতিচ্ছবি। একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে এই পরিবর্তনগুলো আমাদের বুঝা খুবই জরুরী, কারণ ভবিষ্যতের ফ্যাশন গঠনে আমাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। "সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই বর্তমান ফ্যাশনের মূল বার্তা"।

এক ছাতার নিচে পুরো ঢাকা

(কৌশিক এস খান, ব্যাচ ১১, DTE)

ঢাকায় বৃষ্টি কখন আসে, সেটা কেউ জানে না। কিন্তু সবাই জানে—বৃষ্টি আসলে ঝামেলা হবেই। সেদিন রোদ ছিল। আমি ফার্মগেটের ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছিলাম। ফুটপাতে মানুষ এমন ভিড় করে হাঁটছিল যেন সবাই দৌড়ের রিহার্সাল দিচ্ছে। বাসের হর্ন, রিকশার ঘণ্টা, বাদাম ওয়ালার ডাক—সব মিলিয়ে ঢাকার চেনা শব্দ। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম এক চা-দোকানের পাশে। ব্যাগে একটা ছাতা ছিল। এমন ছাতা, যেটা খুললে মনে হয় দুজনের বেশি ঢুকলে ঝগড়া লেগে যাবে। হঠাৎ করেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। আর পরক্ষণেই বৃষ্টি পড়ল। ঢাকায় বৃষ্টি নামলে মানুষ আবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল তো দৌড়ায়। আরকদল দাঁড়িয়ে ভাবে—'যা হবার হবে'। আমি আবার দ্বিতীয় দলে। ছাতাটা খুললাম। অনেক সময় এমন মনে হয় যেন ছাতা খুললে কেউ না কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে। যখনই এসব ভাবতে থাকলাম, ঠিক তখনই একটা ছোট ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল। বয়স সাত-আট হবে। স্কুলের ব্যাগ পিঠে, চুল ভিজে গেছে। সে খুব সিরিয়াস মুখে বলল, "ভাইয়া, ঢুকি?" আমি হাসলাম, "ঢুকো"। সে ঢুকেই ঘোষণা দিল, "আমি ভিজতে চাই না। মা বকা দেবে"। ঠিক তখনই আরেকটা মেয়ে এসে বলল, "আমি একটু দাঁড়াই?" তারপর এক চাচা, তারপর আরেকজন।

দেখতে দেখতে আমার ছোট ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে গেল—আমি, দুইটা বাচ্চা, আর দুইজন বড় মানুষ। ছোট ছেলেটা বলল, "এটা তো মিনিবাস"। সবাই হেসে বলল, বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ির পানি ছিটাচ্ছে, আর আমরা পাঁচজন অচেনা মানুষ—এক ছাতার নিচে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটা বলল, "ঢাকায় থাকলে বন্ধু লাগে না"। চাচা বললেন, "ছোটবেলায় এমনই হতো, এখন সবাই আলাদা"। তখন ছেলেটা বলল, "আমরা তো আলাদা না"। কথা শুনে একটু হাসলাম এবং অবাকও লাগল।

বৃষ্টি আরও জোরে পড়ছিল। কেউ একজন বলল, "এই বৃষ্টি থামবে না মনে হয়"। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "থামবে। ঢাকার বৃষ্টি রাগী, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না"। ঠিক তখনই—বৃষ্টি থেমে গেল এক সেকেন্ডে। ঢাকায় এমনটাই হয়। মনে হয় যেন কেউ ওপর থেকে সুইচ বন্ধ করে দিল। লোকজন ছাতার নিচ থেকে বের হতে শুরু করল। চাচা বললেন, "ভালো থাকবেন"। ছোট মেয়েটা হাত নেড়ে চলে গেল। ছোট ছেলেটা যাওয়ার আগে আমাকে বলছে, "ভাইয়া, আজ বৃষ্টি ভালো লাগছে"। আমি বললাম, "কেন?" সে বলল, "কারণ আজ কেউ কাউকে ঠেলে দেয়নি"। এই কথা বলে সে দৌড়ে চলে গেল।

আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম। চারপাশে আবার ঢাকার চেনা কোলাহল। মানুষ হাঁটছে, বাস ছাড়ছে, কেউ কাউকে চিনছে না। আমি ছাতাটা ভাঁজ করলাম। ঢাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ একসাথে থাকে, কিন্তু খুব কম সময়ই একসাথে দাঁড়ায়। সেদিন শুধু একটুখানি বৃষ্টি দরকার হয়েছিল। আর একটা ছোট ছাতা। আজও ঢাকায় বৃষ্টি হলে আমি ছাতাটা খুলি। কারও ঢোকার দরকার হলে জায়গা দিই। কারণ কখনো কখনো এক ছাতার নিচে পুরো ঢাকাটা একটু ভালো হয়ে যায়।

সীমান্ত পেরিয়ে দার্জিলিং

এক বাংলাদেশি পথিকের দিনলিপি

(মোঃ জাহিদ হাসান, সিনিয়র প্রভাষক, DTE)

ফাল্গুনের এক বিষন্ন সকাল। য়ুনিভার্সিটি ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা ক্লান্তি যেন শরীরের প্রতিটি কোণে ভর করেছে।। গল্পে গল্পে হঠাৎ মূসা আলী রেজা স্যার ইন্ডিয়া ঘুরতে যাবার কথা বললেন। আমি কালক্ষেপণ না করেই বলেছিলাম, চলুন এখনই প্লান করি।

রাত পৌনে বারোটায় ঢাকা টু কলকাতা সৌদিয়া পরিবহনের বাসে চেপে বসলাম। পূবের আকাশে সূর্য উঁকি দেয়ার আগেই যশোর বেনাপোল পোর্টে পৌঁছুলাম। ভাবলাম সূর্য ওঠার আগেই ইমিগ্রেশন ঝামেলা শেষ করে গা-ছমছমে এক নতুন শহরে প্রবেশ করবো। কিন্তু তা হলো না। এই পয়েন্টে দারুণভাবে ভোগান্তির স্বীকার হয়েছি। সকাল সাড়ে ছয়টায় বেনাপোল-পেট্রোপোল সীমান্ত পাড়ি দেবার অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়িয়েছি। বেলা এগারোটায় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সকল কাজ শেষ করে ওপারে যেয়ে বাসে উঠেছি। প্রচন্ড দাবদাহে দগ্ধ হয়েছি। আর মনে হচ্ছিলো শরীরটা যেন ধীরে ধীরে তন্দুরে ঢুকছে। আর মৃদুস্বরে সিস্টেমকে ভৎসনা করে মনে মনে শপথ নিয়ে বললাম- এই পোর্ট দিয়ে আর আসবো না।

বাস চলছে। গন্তব্য-নিউমার্কেট, কলকাতা। পথে পশ্চিমবঙ্গের নর্থ ২৪ পরগণায় একটা হোটেলে বিরতি। মাছ ভাত খেলাম ৩৫০ রুপিতে। পরে বুঝলাম দাম বেশি নিয়েছে । কলকাতা এসে দেখি এখানে ১২০ রুপিতে ফুল প্লেট বীফ, সাদা ভাত। বাস থেকে নামার সময় দেখি ব্যাগ বা পকেটে মোবাইল নেই। ব্যাগ কাঁধে, চোখে ঘুম, মাথায় ঝিমুনি। শেষ যাত্রী হিসেবে নামতে নামতে হঠাৎ কী মনে করে পিছনের সিটে গেলাম। দেখি নিচে পড়ে আছে মোবাইলটা।

কলকাতার মারকুইস স্ট্রিট আর মির্জা গালিব স্ট্রিট— বাংলাদেশি পর্যটকদের ক্ষুদ্র উপনিবেশ। মার্কুইস স্ট্রিটের আশপাশে বহু হোটেল খুঁজে দুটো ডাবল বেডের রুম পেয়েছি রাজা গেস্ট হাউস-এ। বাস থেকে নেমে পাশের সীটের দু'জন মিরপুরের ভাইকে সফরসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। মধ্যরাত অবধি আড্ডা চলেছে। নিউমার্কেট এরিয়া হেঁটে চষে বেরিয়েছি। অচেনা মানুষগুলো কেমন আপন হয়ে গিয়েছে! ইমিগ্রেশন লাইনে বা একই বাসে যাদের সাথে দেখা হয়েছে তাদের অনেকের সাথেই রাতে দেখা হয়েছে। কাকতালীয় ভাবে দু-চার জন একই হোটেলে উঠেছি। চেনাপরিচয় নেই। তবুও আন্তরিকতার ঘাটতি নেই।

পরের দিন প্রচন্ড দাবদাহ। কলকাতার তাপমাত্রা ৪৫°C। সুপ্রশস্থ রাজপথের পীচ গলে জুতোর সাথে যেন প্রেম করছে। হোটেল থেকে বেরিয়েছি কাক ডাকা দুপুরে। গন্তব্য ধর্মতলা বাসস্টপ। সন্ধ্যা ৬টার শিলিগুড়ির বসের টিকিট করে গিয়েছি বড়বাজার হওরা'র বাসে উঠে। হেল্পারকে বলেছিলাম জাকারিয়া স্ট্রীটে নামিয়ে দিতে। এমন এক অচেনা গলিতে নামিয়ে দিয়েছে যে জাকারিয়া স্ট্রিটে যেতে ২০ মিনিট হাঁটতে হয়েছে।

ননএসি বাসে সারারাতের ক্লান্তিকর সফর শেষে শিলিগুড়ির এক পেট্রোল পাম্পে নেমেছিলাম। পাশেই রেস্তরাঁ। সেখানকার ম্যানেজারের সাথে দর্জিলিং হোটেল বুকিং কন্টাক্ট শেষে তাদের জীপে উঠে গেলাম। দার্জিলিং শব্দটি উচ্চারণেই কেমন শীতলতা। পথে যেতে যেতে আবহাওয়ার শীতলতার আভাস পাচ্ছিলাম। কলকাতার ভেপসা গরমে অতিষ্ঠ পথিক দার্জিলিং এর আট বা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জ্যাকেট গায়ে উঠিয়েছি।

শিলিগুড়ি থেকে ধীরে ধীরে গাড়ি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে পড়ছে। পাহাড়ের গায়ে সারি সারি চা-বাগান। সবুজের পর সবুজ। যেন জমিনে কেউ মখমল বিছিয়ে রেখেছে। একটা সময় পাহাড় কেটে বানানো সরু রাস্তায় গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ভোরে টাইগার হিলে দাড়িয়ে সূর্য দেখার জন্য হাজারো মানুষ একত্রিত হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী চূড়া দেখা যায়। মেঘের চাদর সরিয়ে মুখখানি দেখায়। সবাই ঘাড় উঁচু করে পূবের আকাশ জুড়ে অনড় দৃষ্টি মেলেছিল। আমি দেখতে পাইনি কিছু। পুরো আকাশটাই সোনারঙ ঝিকিয়ে উঠা কাঞ্চনজঙ্ঘা মনে হচ্ছে।

বাতাসিয়া লুপে খেলনার ট্রেন পাক খেতে খেতে চলে যায়।

দূর থেকে দেখতে মনে হয় খেলনা ট্রেন। শিশুর খেলনা ট্রেনে বড়রা বসে আছে। একেবারে শিলিগুড়ি থেকে এই ট্রেনে দার্জিলিং শহর যাওয়া যায়। পড়ন্ত বিকেলে ঘুম মঠে ঢুকেছি, এখানে অন্যরকম নীরবতা। ঘন্টার মৃদু ধ্বনি, ধূপের গন্ধ, শুনশান নীরবতা থেকে মনে হয় শব্দহীনতাই আসল ভাষা। এখানে এসে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মল রোডে কুয়াশা নামে। পাহাড়ের বুক থেকে কুয়াশা উঠছে ধোঁয়ার মতো। আলো ঝাপসা হয়ে আসে। হাতে গরম ধোঁয়া উঠা চা, সামনে অস্পষ্ট আলোআঁধারির পাহাড় রেখা। পাহাড়ি কন্যা চা সাজিয়ে বসেছে। বিভিন্ন ফ্লেভার আর কোয়ালিটির চা। এখানে গাড়ি চালক থেকে শুরু করে এসব দোকানের বসা লোকজন নেপালী। ওরা ভাঙা হিন্দি আর বাংলায় কথা বলে।

বাংলাদেশিরা সাধারণত দার্জিলিং থেকে চ্যাংড়াবান্দা হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যায়। আমরা শিলিগুড়ি থেকে আবার ছশো কিলো ট্রেন জার্নি করে কলকাতায় এসেছিলাম। আমাদের একজনকে ভিসা অফিসার বাংলাবান্ধা হয়ে আসার অনুমতি দেয় নি। বাংলাদেশিরা ব্যাক করার সময় এতো বেশি শপিং করে যে পারলে পুরো কলকাতাটা নিয়ে চলে আসে। আমরা টুকটাক শপিং করে নিলাম। একটা কথা বলতেই হবে যে, কলকাতায় সবকিছুর দাম বাংলাদেশের চাইতে কম। বাংলাদেশি পর্যটকদের শপিংয়ের উৎসাহ দেখলে মনে হয়—কলকাতা খালি করে নিয়ে যাবেন। সফরসঙ্গী ভাইদের বাসা থেকে সকালসন্ধে নানান লিস্ট আসে। যেমন ধরেন, বাংলাদেশে জিরার দাম বেশি তাই গোঁটা জিরা নিতে হবে চার কেজি। নাইট ক্রিম, ডে ক্রিম, ফেইস ওয়াশ, লিপস্টিক, অনিওন ওয়েল, পাউডার, চকলেট, অয়েনমেন্ট, নাকের ড্রপ, জান্ডু বাম ইত্যাদি। Shreeleathers-এ না ঢুঁ মারলে নাকি সফর অপূর্ণ। সবাই জুতা, বেল্ট, মানিব্যাগ নিয়েছি। মেডিসিন শপে সবধরনের মেডিসিন রিজনেবল প্রাইজে পাওয়া যায়। টুরিস্টরা সাধারণ ব্যাবহারের জন্য বিভিন্ন স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস, ক্রিম, সিরাপ, Balms ইত্যাদি নিয়ে থাকেন।

মির্জা গালিব স্ট্রিট ও মারকুইস স্ট্রিট পাশাপাশি। সাধারণত বাংলাদেশ রিলেটেড সবকিছু এখানে। হোটেল, বাস কাউন্টার, মানি এক্সচেঞ্জার ইত্যাদি। আমি প্রথমবারে মারকুইস স্ট্রিটে হোটেল রাজে ছিলাম। এসি রুম। ১০০০ রুপি পার ডে। এবার ছিলাম ননএসি রুমে, মির্জা গালিব স্ট্রিটে। হোটেল ওমাইরা। ৭৫০ রুপি। পাশেই মদিনা মসজিদ।

কলকাতার ব্যস্ত শহর, শপিংয়ের তীব্র চাঞ্চল্য, শিলিগুড়ির দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা—সব মিলিয়ে এই ভ্রমণ যেন এক সুতোয় গাঁথা। কলকাতার গরম ও ব্যস্ততা যেন শুধুই প্রারম্ভিক, আর পাহাড়ের শান্তি হলো সত্যিকারের পুরস্কার। পথিকের দার্জিলিং যাত্রা—শহর, সীমান্ত, পাহাড়, কুয়াশা, মানুষের গল্প আর চা-বাগানের সবুজ, সব মিলিয়ে একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা যা মনে থেকে যাবে চিরকাল।

নীরব কক্ষের মানুষ

(আনিকা শারমিলা নিঝুম, ব্যাচ ১১, DTE)

ঘরটা আমারই ছিল- তবু সেদিন মনে হচ্ছিল, আমি এখানে অতিথি। ঘড়ির কাঁটা চলছিল, কিন্তু সময় এগোচ্ছিল না। কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে, যারা সময়ের ভেতর পড়ে না।

দেয়ালের মাঝখানে আয়নাটা আগে ছিল না। অথবৎ সেটাকে দেখে মনে হলো, এটা বহুদিন ধরেই এখানে আছে- আমার আগেই।

আমি সামনে দাঁড়ালাম। আয়নায় আমার মুখ ছিল, কিন্তু চোখে কোনো প্রশ্ন নেই। যেন সে অনেক আগেই জেনে গেছে, যা আমি এখনও এড়িয়ে যাচ্ছি।

আমি হাত তুললাম। প্রতিবিম্বটা তুলল দেরিতে- খুব সামান্য দেরিতে, যতটুকু দেরি একজন মানুষ নেয় তার নিজেকে স্বীকার করতে।

পেছন থেকে কণ্ঠ এলো- নরম, কিন্তু অস্বস্তিকর- "মানুষ সবচেয়ে বেশি মিথ্যা বলে নিজের সাথেই।"

আমি ঘুরে তাকালাম। ঘরে কেউ নেই। আবার আয়নায় তাকাতেই সে কথাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। "তুমি আমাকে যতবার চাপা দিয়েছ, আমি ততবার আরও পরিষ্কার হয়েছি।"

তখন বুঝলাম- এই প্রতিবিম্বে আমি নই। এটা আমি, যা হতে পারতাম- কিন্তু হইনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী চাও?" সে শান্তভাবে বলল, "সত্যটা।"
হঠাৎ দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। কোনো শব্দ নেই। কিছু বন্ধ হলে সবসময় শব্দ হয় না- কিছু বন্ধ হয় মানুষের ভেতরে।
আয়নায় তাকিয়ে দেখি, এবার আমি নড়ছি না। সে নড়ছে। সে আমার ভঙ্গিতে দাঁড়াল, আমার কণ্ঠে বলল- "তুমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছিলে। আমি দেরি করিনি। এই পার্থক্যটাই যথেষ্ট।"
ঘরটা ছোট হয়ে আসছিল না, তবু শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কারণ জায়গা কমেনি সাহস কমেছিল।
শেষবার সে বলল, "চিন্তা করো না, সবাই একদিন নিজের জায়গা বদলায়। কেউ আয়নার এপাশে থাকে, কেউ ওপাশে।"
চোখ খুলে গেল। আমি আমার ঘরে। ঘড়ি চলছে। সব স্বাভাবিক। কিন্তু আয়নাটা নেই। তার জায়গায় দেয়ালে লেখা একটাই লাইন- "নিজেকে এড়িয়ে গেলে, একদিন নিজেকেই হারাতে হয়।"
আমি জানি না, আমি আয়নার কোন পাশে আছি। আমি শুধু জানি- কিছু ঘর মানুষ ছেড়ে আসে, আর কিছু ঘর মানুষকে ছাড়ে না।

স্বাধীন চিন্তায় বোনা এক শিক্ষাজীবন

(মো. শাকিবুর রহমান, ব্যাচ ৯, DTE)

স্বাধীনতা শব্দটা আমরা অনেক সময় বড় ব্যানারে লিখি-দেশ, ইতিহাস, বিজয়। কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাধীনতা কোনো স্লোগান নয়; এটা প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ, সময় ভাগ করা আর দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার নাম। বিশেষ করে যখন পড়াশোনার খরচ নিজেকেই বহন করতে হয়, তখন স্বাধীনতা আর স্বাচ্ছন্দ্য এক জিনিস থাকে না। এই ভিন্নতা থেকেই আমি প্রথমবার নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবতে শুরু করি-আমি আসলে কী চাই, আর কীভাবে এগোতে চাই।
নিজের ওপর বিশ্বাস আর এক ধরনের জেদ আমাকে থামতে দেয়নি। পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব শক্ত ছিল না। তবুও সবার মতের বাইরে গিয়ে, নিজের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রেখে আমি ঢাকায় চলে আসি। ভর্তি হই একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। জানতাম-এই সিদ্ধান্তের মানে হলো নিজের জীবনের দায় পুরোপুরি নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। এখান থেকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থটা আমার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছেমতো চলা নয়, স্বাধীনতা মানে নিজের সিদ্ধান্তের ফল নিজে সামলানো। পড়াশোনা, খরচ, ভবিষ্যৎ-সব কিছুই তখন আমার নিজের পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল।
স্কুল জীবন থেকেই টিউশন করানোর অভিজ্ঞতা ছিল, তাই ঢাকায় এসে সেটাকেই কাজে লাগাই। টিউশন পাওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু ধৈর্য ধরে লেগে থেকেছি। এই প্রক্রিয়াটা আমাকে শিখিয়েছে-টেক্সটাইলের মতোই, স্থায়ী কিছু গড়তে হলে নিয়ম আর ধারাবাহিকতা জরুরি। একসময় আল্লাহর রহমতে একটি টিউশন পাই-খুব বড় কিছু না, কিন্তু নিজের আয় দিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটানোর অনুভূতিটা ছিল আলাদা। তখন বুঝলাম-এই ছোট ছোট অর্জনই আসলে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। এরপর থেকে টিউশন, ক্লাস আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন একসাথে চালিয়ে যাচ্ছি।
ধীরে ধীরে নিজের একটা ছন্দ তৈরি হয়েছে। আজ যে মানুষগুলো একসময় আমার পথ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল, তারাই এখন আমার চেষ্টা আর দৃঢ়তাকে সম্মান করে। এই যাত্রা আমাকে শিখিয়েছে-স্বাধীনতা মানে সব কিছু সহজ হওয়া নয়। স্বাধীনতা মানে চাপের মাঝেও নিজের অবস্থান ধরে রাখা। আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। এই বিষয়টা আমাকে শিখিয়েছে-ভালো কাপড় তৈরি হয় সময় নিয়ে, নিয়ম মেনে, নিখুঁতভাবে। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে এগোতে হয়।
শিক্ষায় স্বাধীনতা মানে শুধু ভালো রেজাল্ট নয়। শিক্ষায় স্বাধীনতা হলো-নিজের জীবনকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার সাহস। নিজের পরিশ্রম, নিজের ভুল, নিজের শেখার প্রক্রিয়াকে সম্মান করা। আর সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে হাল না ছাড়া। এখানেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সত্যিকারের মানে লুকিয়ে আছে।

অনিবার্য বিজয়

(এস. এম ফারদিন ইবনে ছাফিন, ব্যাচ ৮, DTE)

"পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার
প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়?"

(সূরা আল-হিজর: ৫৬)

যে জাতির হাতে কুরআনের মতো কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ রয়েছে, সেই জাতির হতাশ হওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা আমাদের ভিন্ন এক গল্পের কথা বলে। আজ মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের চোখে একরাশ ক্লান্তি আর অন্তরে এক গভীর শূন্যতা। কিন্তু কেন? কেন আমরা সাহসের চেয়ে বেশি ভয় আর আশার চেয়ে বেশি হতাশাকে স্থান দিচ্ছি?

১. বর্তমান সময়ের রূঢ় বাস্তবতা
মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকটের মূলে রয়েছে কিছু ঐতিহাসিক ও মানসিক পরাজয়

খিলাফতের অবসান: ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলিম উম্মাহ একটি কেন্দ্রীয় অভিভাবকত্ব হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

মানসিক দাসত্ব: দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে পশ্চিমা জীবনদর্শনের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা: প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকায় আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র ও অবক্ষয়
মুসলিমদের হীনম্মন্যতায় ফেলার জন্য দীর্ঘকাল ধরে কয়েকটি গোষ্ঠী সুকৌশলে কাজ করে যাচ্ছে:
প্রাচ্যবিদ (Orientalists): ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে মুসলিম যুবকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এদের মূল লক্ষ্য।
পাশ্চাত্যের মোহ (Occidentalists): পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের মানদণ্ড বানিয়ে ইসলামকে 'পিছিয়ে পড়া' ধর্ম হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা।

ঔপনিবেশিক মানসিকতা: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন এক ধারা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের নিজের ইতিহাসকে ঘৃণা করতে শেখায়।

৩. নেতিবাচক মনোভাব: আমাদের ভেতরের শত্রু
আমাদের হতাশার বড় একটি কারণ হলো আমরা অলৌকিক কিছুর অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকি। প্রতিকূল পরিবেশ দেখলে আমরা হাল ছেড়ে দেই, যা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী।

উত্তরণের পথ: আমরা কী করতে পারি?
হতাশা কোনো সমাধান নয়, বরং এটি একটি ব্যাধি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের তিনটি স্তরে কাজ করতে হবে:

জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব: আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সেরা হতে হবে।
ইতিহাস সচেতনতা: আমাদের গৌরবময় সোনালী ইতিহাস জানতে হবে, যেন আমরা হীনম্মন্যতায় না ভুগি।
সক্রিয়তা (Action): অন্যের সমালোচনা না করে নিজের জায়গা থেকে ছোট ছোট পরিবর্তন আনা শুরু করতে হবে।

পরিশেষ:
রাত যত গভীর হয়, ভোরের আলো তত কাছে আসে। মুসলিম উম্মাহর এই সংকটকাল চিরস্থায়ী নয়। যদি আমরা আমাদের ঈমানি চেতনা আর কর্মস্পৃহা ফিরিয়ে আনতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ আবারও সোনালী ভোরের দেখা মিলবে।

(মেহেদি হাসান মাহফুজ, ব্যাচ ৬, DTE)

Made in Bangladesh: একটি ট্যাগের আড়ালে আমাদের হৃদস্পন্দন (The Pulse Behind a Label)

(সাদিয়া আক্তার, ব্যাচ ৯, DTE)

নিউ ইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউ বা লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের কোনো ঝলমলে শোরুমে যখন একজন ক্রেতা একটি দামি জ্যাকেট হাতে নেন, তখন তার চোখ পড়ে ঘাড়ের কাছে থাকা ছোট্ট এক টুকরো কাপড়ে সেখানে লেখা থাকে 'Made in Bangladesh' । ক্রেতার কাছে এটি হয়তো কেবল একটি অরিজিন ট্যাগ, কিন্তু আমাদের কাছে এটি কয়েক দশকের ঘাম, শ্রম আর ঘুরে দাঁড়ানোর এক জীবন্ত মহাকাব্য । যে দেশটির যাত্রা শুরু হয়েছিল নানা প্রতিকূলতা আর অভাবের অপবাদ নিয়ে, আজ সেই দেশটিই বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অঙ্গে আভিজাত্য আর স্বাচ্ছন্দ্য তুলে দিচ্ছে । তাই "Made in Bangladesh" আজ আর কেবল কোনো পোশাকের পরিচয় নয়; এটি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের এক অদম্য সক্ষমতার স্বাক্ষর এবং আমাদের আত্মমর্যাদার নতুন নাম ।

এই রূপান্তরের গল্পটি কেবল জিডিপির শুষ্ক পরিসংখ্যানের নয়, এটি আসলে আমাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের । সাভার, গাজীপুর কিংবা চট্টগ্রামের ভোরে যখন কুয়াশা ভেদ করে হাজার হাজার নারী শ্রমিক দল বেঁধে কারখানার দিকে ছোটেন, তখন তাদের পায়ের শব্দে প্রতিদিন বাংলাদেশের অর্থনীতি জেগে ওঠে । এই নারীরা যখন সেলাই মেশিনের চাকা ঘোরান, তখন তারা কেবল সুতো দিয়ে কাপড় বোনেন না, তারা আসলে বোনেন তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ । গ্রামের যে মেয়েটি এক সময় নিজের স্বপ্নের কথা বলতে দ্বিধা করত, আজ সে তার নিজের উপার্জিত টাকায় ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা করায় কিংবা অসুস্থ মা-বাবার ওষুধের ভার নেয় । এই লাখো সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠা, এটাই 'Made in Bangladesh' ট্যাগের আসল মাহাত্ম্য ।

আমাদের এই অর্জন কেবল কত কোটি ডলারের রপ্তানি হলো সেই সংখ্যায় আটকে নেই । আজ বাংলাদেশ যখন বড় বড় স্বপ্ন দেখে, নিজস্ব অর্থায়নে বিশাল সব সেতু বানায় কিংবা প্রযুক্তির পথে হাঁটে—তার পেছনের জ্বালানি আসে ওই লাখো মানুষের হাতের জাদুতে । আমরা আজ আর কারো কাছে হাত পেতে থাকা জাতি নই; বরং আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ডগুলো আমাদের কারিগরদের দক্ষতার ওপর ভরসা করে টিকে আছে । এই এক ধরণের নীরব নির্ভরতা বিশ্বজুড়ে আমরা তৈরি করতে পেরেছি, এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয় ।

আমরা কেবল সংখ্যায় বাড়িনি, আমরা আমাদের মননেও বড় হয়েছি । আজ যখন বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে হাহাকার করছে, তখন বাংলাদেশের মানুষ দেখিয়েছে কীভাবে প্রকৃতিকে ভালোবেসেও শ্রেষ্ঠ পণ্য বানানো যায় । বিশ্বের সেরা গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলো এখন আমাদের মাটির ওপর দাঁড়িয়ে । আমরা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছি, আমরা কেবল পণ্যই দিই না, আমরা আমাদের কারিগরদের মর্যাদা আর পৃথিবীর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই প্রতিটি সেলাই দিই । এটি আমাদের নৈতিক জয়, যা বিশ্ববাজারে আমাদের সম্মানকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে ।

অবশ্যই আগামী দিনগুলো সহজ হবে না । প্রযুক্তির এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে আমাদের আরও শিখতে হবে, আরও দক্ষ হতে হবে । কিন্তু যে জাতি শূন্য হাতে শুরু করে আজ বিশ্বের মানুষের আলমারি দখল করে নিয়েছে, তারা জানে হার মানার কোনো সুযোগ নেই । প্রতিটি প্রতিকূলতায় আমরা নতুন করে শিখি, নতুন করে লড়াই করি ।

পরিশেষে, "Made in Bangladesh" কেবল একটি সুতোর লেবেল নয়, এটি আমাদের জাতীয় গৌরবের প্রতীক । এটি আমাদের মেধা, আমাদের জেদ এবং আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্মারক । যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের মানুষের গায়ে আমাদের সেলাই করা কাপড় থাকবে, ততক্ষণ বৈশ্বিক মানচিত্রে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে । এটি আমাদের অস্তিত্বের এমন এক স্বাক্ষর, যা প্রতিমুহূর্তে বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয়- বাংলাদেশ তার নিজের হাতের জাদুতে আজ বিশ্ব জয় করেছে । এটি কেবল একটি ব্যবসা নয়, এটি একটি জাতির গর্বের নিঃশ্বাস ।

আমি যেভাবে ফ্যাশন দেখি:
একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থীর চোখে ইন্ডাস্ট্রি

(মো. শাকিবুর রহমান, ব্যাচ ৯, DTE)

ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বললেই আমাদের সামনে আগে আসে সুন্দর পোশাক, ট্রেন্ড আর গ্ল্যামারের ছবি। কিন্তু একজন টেক্সটাইলের ছাত্র হিসেবে আমি যখন ফ্যাশন দেখি, তখন শুধু পোশাক দেখি না। আমি দেখি কাপড়ের গঠন, ফাইবারের আচরণ, মেশিনের শব্দ আর সেই অদৃশ্য প্রক্রিয়াগুলো যেগুলো ছাড়া কোনো ফ্যাশনই বাস্তবে রূপ নেয় না। আমার কাছে ফ্যাশন মানে শুধু সুন্দরভাবে পরা না, বরং বুঝে বানানো।

একটা পোশাক কখনোই ডিজাইনারের স্কেচ দিয়ে শুরু হয় না। শুরু হয় সুতা দিয়ে, ফাইবার দিয়ে। কটন কেন আরামদায়ক, ডেনিম কেন টেকসই, স্প্যানডেক্স কেন শরীরের সাথে মিশে যায়-এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লুকিয়ে আছে টেক্সটাইলের ভেতরে। ফ্যাশনের স্বাধীনতা আসলে টেক্সটাইলের সীমার মধ্যেই গড়ে ওঠে। আজকের যে বডি-ফিট জামা, স্ট্রেচেবল প্যান্ট বা অ্যাথলেজার ট্রেন্ড-এসব হঠাৎ আসেনি। এগুলো এসেছে টেক্সটাইলের উন্নতির হাত ধরেই। ফ্যাব্রিক যত স্মার্ট হয়েছে, ফ্যাশন ততটা সাহসী হয়েছে। এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা টেক্সটাইলের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকে মনে করে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি মানেই শুধু পোশাক। কিন্তু বাস্তবে ফ্যাশন আজ লাইফস্টাইলের অংশ। স্পোর্টসওয়্যারে ঘাম শোষণকারী কাপড়, রোদে ইউভি প্রটেকশন দেওয়া ফ্যাব্রিক, আবার আরামের জন্য সফট টেক্সচার-এসব কিছুই ফ্যাশনের ভেতরে ঢুকে গেছে। এখানেই বোঝা যায়, ফ্যাশন শুধু চোখের জন্য না, শরীরের জন্যও।

বাংলাদেশের কথা ভাবলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়। আমরা বিশ্বের বড় বড় ব্র্যান্ডের পোশাক বানাই। লক্ষ মানুষের জীবিকা এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত। কিন্তু একজন ছাত্র হিসেবে আমার মনে প্রশ্ন আসে-আমরা কি শুধু বানাবো, নাকি একদিন নিজের মতো করে ভাববো? ফ্যাশন মানে কি শুধু অন্যের ডিজাইন ফলো করা? নাকি নিজের পরিচয় তৈরি করা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভবিষ্যতের টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের হাতেই।

আজকের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির আরেকটা বাস্তবতা হলো ফাস্ট ফ্যাশন। কম দামে, দ্রুত পোশাক-সবাই চায়। কিন্তু এর পেছনের গল্পটা সুন্দর না। পানি অপচয়, রাসায়নিক বর্জ্য, কাপড়ের পাহাড়-এসব আমাদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তার বিষয়। এখানে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। টেকসই ফ্যাশন এখন আর ফ্যান্সি শব্দ না। এটা প্রয়োজন। রিসাইকেল ফাইবার, পরিবেশবান্ধব প্রসেস, কম পানি ব্যবহার-এসব যদি এখনই গুরুত্ব না পায়, তাহলে ফ্যাশনের এই উজ্জ্বলতা বেশিদিন থাকবে না।

একজন টেক্সটাইল স্টুডেন্ট হিসেবে আমি মনে করি, ফ্যাশনকে শুধু ট্রেন্ড দিয়ে বিচার করলে চলবে না। আমাদের বুঝতে হবে এর প্রভাব, এর দায়বদ্ধতা। আমরা যারা আজ শিখছি, কাল তারাই সিদ্ধান্ত নেবে-কীভাবে কাপড় বানানো হবে, কীভাবে ফ্যাশন এগোবে। শেষ পর্যন্ত ফ্যাশন বদলাবে, ট্রেন্ড আসবে-যাবে। কিন্তু কাপড়, সুতা আর টেক্সটাইল-এই নীরব শক্তিটাই ফ্যাশনকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর একজন ছাত্র হিসেবে আমি চাই, ফ্যাশন শুধু সুন্দর না হোক-অর্থবহও হোক।

(সালওয়া মুক্তাদির লামিয়া, ব্যাচ ১২, DTE)

নীরব প্রার্থনা

(তনুশ্রী রক্ষিত, ব্যাচ ১০, DTE)

দুঃখ যদি দাও হে প্রভু, তবে দিও সহনের বল।
ভেঙ্গে না যাই অন্ধকারে,
রেখো আমার চিও অচল।
ভাগ্যের লিখন কিভাবে খন্ডিব আমি,
লেখা যে তব করতল।
আমি শুধু নীরব পাঠক,
তুমি তার শেষ ফল।
আঘাত এসে থামলে পড়ে,
শেখাও নীরব স্থিরতা।
অন্ধকারেও আলো খুঁজি, এই প্রার্থনাই বিনয়তা।

তাঁত এবং সুতা

(মুশফিকুর রহমান সাদী, ব্যাচ ১৩, DTE)

টেক্সটাইল ল্যাবই ছিল ক্যাম্পাসের একমাত্র জায়গা যেখানে বাতাসে ভারী অনুভূতি ভাসত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি অংশ যখন ফাইবার-অপটিক কেবল এবং উজ্জ্বল টাচস্ক্রিনের নীরব স্ক্রলিংয়ে গুঞ্জন করছিল, তখন ল্যাবটি তাঁত, কাঁচা পশম এবং ইন্ডিগো ডাইয়ের সুবাসে সমৃদ্ধ ছিল।

সোফিয়া, মেশিন তাঁতের সামনে বসে ছিল, তার আঙুলগুলো তাঁতের সুতোয় নাচছিল। সে ছিল ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের একজন মেজর, কিন্তু সে তার বেশিরভাগ সময় আর্টস ভবনের বেসমেন্টে কাটাতো। তার কাছে কাপড় কেবল কাপড় ছিল না। এটি ছিল একটি কাঠামোগত বিস্ময়—আকৃতি ও রূপের যৌক্তিকতা।

তার বর্তমান প্রজেক্টের নাম ছিল "Memory Weave"। উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি টেক্সটাইল ডিজাইন করা যা কাঠামো, প্যাটার্ন এবং উপাদানের মাধ্যমে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি ও যাত্রাকে দৃশ্যমান করে তুলবে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী আবেগ বা অর্জনের অনুভূতি প্রকাশ করতে রঙ বেছে নেয়। তবে সোফিয়া রঙের পরিবর্তে টেক্সচারকে বেছে নিয়েছিল তার অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে।

সে রুক্ষ সুতার একটি বুনন তৈরি করল। এটি ছিল মোটা এবং একগুঁয়ে—যেন পাক খাওয়ার প্রবণতা আছে। এটি অনেকটা সোফিয়ার প্রথম দিনের মতো—অগোছালো ল্যাব রিপোর্ট আর অচেনা ক্যাম্পাসের ভারে নুয়ে পড়া। সে শেডের মধ্য দিয়ে শাটল চালিয়ে দিল এবং হেম্পটি ঠিক অবস্থানে স্থির হয়ে গেল।

এরপর সে যুক্ত করল স্পিনিং করা উচ্চ টেনসাইল শক্তির একটি সিল্ক সুতো। এটি ছিল তার সেই মুহূর্ত—যেদিন প্রথমবার কোনো জটিল সমীকরণ হঠাৎ করে বোধগম্য হয়ে ওঠে, এবং মধ্যরাতের পড়াশোনায় আকস্মিক স্বচ্ছতা আসে। সিল্কটি ছিল পাতলা, কিন্তু ছেঁড়া প্রায় অসম্ভব।

সোফিয়া যখন কাজ করছিল, তখন আচমকা ভেসে আসা একটি কণ্ঠ তাকে চমকে দিল।

"বাম পাশটা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত হয়ে আছে।"

মুখ তুলে তাকাতেই সে দেখল ইলিয়ানকে। দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চারুকলার সেই ছাত্রটি, যে প্রায় প্রতিদিন বিশাল ক্যানভাসে রঙ করে। তার হাতে সবসময়ই হালকা লাল রঙের ছাপ লেগে থাকে।

ইলিয়ান ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলল,
"যদি তুমি এটাকে এত জোরে টেনে নাও, তাহলে কাপড়টাতে ভাঁজ পড়বে। তাঁত থেকে নামানোর সময় এটি শ্বাস নিতে পারবে না। শক্তিশালী হতে কাপড়ের একটু নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন।"
সোফিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল,
"ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মান নিরূপণ করা হয়। এখানে নমনীয়তা নয়, স্থায়িত্বই গুরুত্বপূর্ণ।"
ইলিয়ান হেসে রুক্ষ সুতো আর মসৃণ সিল্ক স্পর্শ করল।
"কিন্তু স্থিতিশীল হতে হলে নমনীয় হওয়া দরকার। কাপড় শরীরের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তৈরি হয়। এটি ধোয়া, বাতাস এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের চাপ সহ্য করার জন্য তৈরি।"
সে একটি গভীর নীল রঙের নরম পুনর্ব্যবহৃত তুলার সুতো সোফিয়ার হাতে দিল।
"এটা আগে তোমার নজরে আসেনি। এখানে বিভিন্ন তন্তু মিশ্রিত আছে। কিছুটা মলিন, তবে পুরো কাঠামোকে স্থিতিশীল রাখে।"
সোফিয়া সুতোটি হাতে নিল। কাজ করতে করতে সে লক্ষ্য করল, কাপড়টি যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে।
সে উপলব্ধি করল—ইলিয়ান ঠিকই বলেছে। সুতোর নিখুঁততার কারণে কাপড়ের সৌন্দর্য আসে না; বরং রুক্ষ সুতো সূক্ষ্ম সিল্ককে ধরে রাখে, আর অগোছালো তুলা ফাঁকা স্থানগুলো পূরণ করে। পারস্পরিক সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণতা।
ল্যাবের চারপাশে তাকিয়ে সোফিয়া ভাবল—ফ্যাশন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, ইতিহাসবিদদের গভীরতা, রসায়নবিদদের বিশ্লেষণ, আর শিল্পীদের অনুভূতি—প্রত্যেকটি আলাদা তন্তুর মতো ছড়িয়ে আছে।
একাকী তারা সহজেই ভেঙে যেতে পারত, হারিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এই মিলিত জায়গায় তারা একসাথে বোনা হয়ে তৈরি করছে একটি জটিল, সমন্বিত ট্যাপেস্ট্রি—যেখানে প্রতিটি সুতো তার নিজস্ব গল্প বলে।
সোফিয়া ভাবল—বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি পাওয়ার জায়গা নয়; এটি একটি তাঁত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো যেন তাঁতের ফ্রেম, আর তারা সেই সুতো, যারা প্রতিটি গতিতে নতুন মানুষের সাথে জড়িয়ে যায়—যাদের সাথে তারা অন্যভাবে কখনও পরিচিত হতো না।
মিলেমিশে তারা তৈরি করেছে একটি জটিল, অনন্য প্যাটার্ন—যা কেউ একা কখনও তৈরি করতে পারত না।
সোফিয়া গতি কমিয়ে দিল। শাটল ধীরে এগোতে লাগল। সে তার কাজের প্রতি মনোযোগ দিল—ঠকঠক শব্দের তাল।
শাটল চলল, সুতো মিলল, আর সোফিয়া বুঝতে পারল—সে শুধু একটি কাপড় বুনছিল না; প্রতিটি নকশা, প্রতিটি ছন্দ তাকে শেখাচ্ছিল কীভাবে জীবনের সবকিছুকে একসাথে ধরে রাখা যায়।

কলোনিয়াল লুম থেকে জাতীয় কারখানা: শিকল ভাঙার বুনন

(সাদিয়া আক্তার, ব্যাচ ৯, DTE)

বাংলার মসলিন যখন রোমান সাম্রাজ্যের রাজদরবারে আভিজাত্যের শেষ কথা ছিল, তখন কেউ কল্পনাও করেনি-এই জনপদের তাঁতশিল্প একদিন ইতিহাসের নির্মমতম শোষণের শিকার হবে। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক মুক্তির দলিল নয়; এটি একটি জাতির অর্থনৈতিক আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ম্যানচেস্টারের কলকারখানার স্বার্থ রক্ষার্থে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁতিদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত কর, রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা ও নীরব দমন ছিল সেই 'কলোনিয়াল লুম'-এর অদৃশ্য কিন্তু ভয়াবহ শিকল। একসময় বিশ্ববাজারে গর্বের সঙ্গে পরিচিত বাংলার বস্ত্র শিল্প ধীরে ধীরে পরিণত হয় নিছক কাঁচামাল সরবরাহকারী এক শোষিত জনপদে।
১৯৪৭ সালের দেশভাগ নতুন রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করলেও অর্থনৈতিক মুক্তি তখনও অধরা ছিল। পরবর্তী দুই

দশক জুড়ে এই ভূখণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে এক ভিন্ন মাত্রার অর্থনৈতিক বৈষম্য। সোনালি আঁশ পাটের ঘামে অর্জিত মুনাফা গড়ে তুলেছে অন্য দেশের শিল্পভিত্তি, অথচ এ দেশের টেক্সটাইল ও জুট মিলগুলো থেকেছে অবহেলার অন্ধকারে। আমাদের সম্পদ, আমাদের শ্রম-কিন্তু লাভের ভাগীদার অন্য কেউ। এই বৈপরীত্যই ধীরে ধীরে বাঙালির মনে জন্ম দেয় স্বাধীনতার গভীর আকাঙ্ক্ষা। এটি ছিল নিজের চরকায় তেল দেওয়ার অধিকার আদায়ের লড়াই, নিজের কারখানায় নিজের কাপড় বোনার স্বপ্ন দেখার লড়াই।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতা ছিল সেই স্বপ্নের প্রথম দৃঢ় উচ্চারণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত এক দেশ নিয়ে শুরু হয় কঠিন পুনর্গঠনের পথচলা। স্বাধীনতার পর শিল্পকারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার মাধ্যমে 'জাতীয় কারখানা'র ধারণা বাস্তব রূপ পেতে থাকে। সেই উদ্যোগগুলো ছিল আত্মনির্ভরতার প্রথম সংগঠিত পদক্ষেপ। শূন্য থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থানকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। যেখানে একসময় রপ্তানি আয় ছিল নগণ্য, সেখানে আজ বাংলাদেশ বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ রাষ্ট্র। বর্তমানে জাতীয় জিডিপিতে টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের অবদান দুই অঙ্কের বেশি এবং মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে এই খাত থেকে।

আমাদের এই 'স্প্যানডেক্স' যেমন চরম চাপ সহ্য করেও ছিঁড়ে না গিয়ে নিজের অবস্থায় ফিরে আসে, ঠিক তেমনই আমাদের টেক্সটাইল শিল্পও ইতিহাসের নির্মম চাপ সহ্য করে আজ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণ ও যুদ্ধের ক্ষত পেরিয়ে এই শিল্প আজ বৈশ্বিক এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। একসময় যে জাতি ম্যানচেস্টারের ওপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সেই জাতির পোশাক বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডে 'Made in Bangladesh' ট্যাগ বহন করছে গর্বের সঙ্গে। আমরা এখন আর কেবল সেলাই যন্ত্রে সীমাবদ্ধ নই-আমরা প্রবেশ করেছি অটোমেশন, গ্রিন ফ্যাক্টরি, স্মার্ট ও টেকসই টেক্সটাইলের যুগে। এই বিবর্তন কেবল সুতো আর কাপড়ের নয়; এটি একটি জাতির আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার গল্প।

স্বাধীনতা দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে মনে রাখা জরুরি-প্রতিটি সুতোর টান আর মাকুর শব্দের পেছনে লুকিয়ে আছে লাখো মানুষের শ্রম, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ। কলোনিয়াল লুমের সেই দীর্ঘশ্বাস আজ জাতীয় কারখানার গগনবিদারী সাইরেনে রূপ নিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের স্বনির্ভরতার জয়গান গেয়ে চলেছে।

সুতোয় বোনা গল্প : ফ্যাশন থেকে ফিউচার শৈল্পিক বুননে আগামীর পথে আমাদের পথচলা

(মোহসানা আক্তার, ব্যাচ ১০, DTE)

সুতোর বাঁধনে স্বপ্ন বুনি, কাপড়ে আঁকি প্রাণ, ফ্যাশিন যখন কথা বলে, গায় সভ্যতার গান। বিজ্ঞানে মোড়া শিল্প মোদের, হাজার বছর ধরে, টেক্সটাইলই নতুনের আলো, বিশ্ব জয় করে।

শুরুটা হোক একটা প্রশ্ন দিয়ে- সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ভাবেন, আজ কী পরব? তখন আপনি কি কেবল একটা পোশাকের কথা ভাবেন? নাকি নিজের কনফিডেন্সের কথা? সত্যি বলতে, টেক্সটাইল আর ফ্যাশন আমাদের কাছে এখন আর স্রেফ কাপড়-চোপড় নেই; এটা হয়ে উঠেছে আমাদের সেকেন্ড স্কিন।

১. ইকোনমির সেই অদৃশ্য হিরো আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ মানেই টেক্সটাইল। কিন্তু এর গভীরতাটা কতটুকু? আমাদের দেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দনটা কিন্তু এই সুতোর টানেই স্পন্দিত হয়। আপনি যে ক্যাম্পাসে টুপিটা পরে ঘুরছেন বা প্রিয় ডেনিমটা পরে আড্ডা দিচ্ছেন, এর পেছনে আছে হাজারো মানুষের স্বপ্ন আর মেধা। গ্লোবাল মার্কেটে আমরা যখন দাপিয়ে বেড়াই, তখন বুঝতে পারি টেক্সটাইল আমাদের জন্য স্রেফ বিজনেস নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই।

জানেন কি? বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাক ডেনিম বা জিন্সের নাম এসেছে ফ্রান্সের Serge de Nimes শহর থেকে। De Nimes থেকেই আজকের Denim নামটির

উৎপত্তি।

২. ফ্যাশন: আপনার সাইলেন্ট ইন্ট্রোডাকশন কথায় বলে, পোশাকই আপনার পরিচয়। ফ্যাশন মানে কিন্তু দামি ব্র্যান্ডের শো-অফ নয়। ফ্যাশন হলো একটা আর্ট। আপনি যখন নিজের মতো করে একটা শার্ট ইন করে বা শাড়িটা একটু অন্যভাবে পরে ক্যাম্পাসে হাঁটেন, তখন কিন্তু আপনি আপনার মুড আর পারসোনালিটি সবার সামনে তুলে ধরছেন। এই যে নিজের সিগনেচার স্টাইল তৈরি করা, এর পেছনের পুরো কারিগরিটাই কিন্তু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আর ফ্যাশন ডিজাইনের এক দুর্দান্ত কম্বিনেশন।

৩. টেক্সটাইল এখন ল্যাবেও! অনেকেই ভাবেন টেক্সটাইল মানেই শুধু সেলাই মেশিন। ভুল! বর্তমানের টেক্সটাইল এখন ল্যাবে তৈরি হচ্ছে। জিপিএস লাগানো স্মার্ট জ্যাকেট থেকে শুরু করে এমন ফেব্রিক যা আপনার হার্টবিট মেপে নেবে। টেক্সটাইল এখন হাই-টেক সায়েন্সের নাম। এমনকি আমাদের ডক্টররা যখন সার্জারি করেন, সেখানেও কিন্তু স্পেশাল টেক্সটাইল থ্রেড লাগে। ভাবা যায়? একটা সুতো কত বড় লাইফসেভার হতে পারে।

কুইক ফ্যাক্ট : মহাকাশে নভোচারীরা যে স্পেসস্যুট পরেন, তার লেয়ারগুলো টেক্সটাইল সায়েন্সের এক চরম বিস্ময়। এটি যেমন বুলেটপ্রুফ, তেমনি এটি রেডিয়েশন থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

৪. পৃথিবী বাঁচুক আপনার স্টাইলে এখনকার ফ্যাশন মানেই কেবল নতুন কিছু নয়, বরং পুরোনোকে বাঁচিয়ে রাখা। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এখন তৈরি হচ্ছে অর্গানিক কটন আর রিসাইকেল ফাইবার। আপনি যখন একটা পরিবেশবান্ধব পোশাক বেছে নিচ্ছেন, তখন আপনি অজান্তেই এই ধরিত্রীকে বাঁচানোর মিশনে যোগ দিচ্ছেন। স্টাইলের সাথে সুস্থ পৃথিবীর এই যে মিলবন্ধন, এটাই তো আধুনিক টেক্সটাইলের আসল সৌন্দর্য।

চমকপ্রদ তথ্য: কেবল একটি সুতির টি-শার্ট তৈরি করতে প্রায় ২,৭০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়! এই কারণেই বর্তমানে সাসটেইনেবল ফ্যাশন বা টেকসই পোশাকের গুরুত্ব এত বাড়ছে।

অনুপ্রেরণার কিছু কথা ফ্যাশন হলো আপনি কী কিনছেন, আর স্টাইল হলো আপনি সেই পোশাকের সাথে কী করছেন। টেক্সটাইল আমাদের সেই সুযোগটাই দেয়, যাতে আমরা প্রতিটি সুতোয় নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি। পরিশেষ টেক্সটাইল কোনো একঘেয়ে ইন্ডাস্ট্রি নয়। এটা হলো সায়েন্স, আর্ট আর ইমোশনের এক অন্যরকম মিশ্রন। আমরা যারা এই সেক্টরের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত, আমাদের গর্ব করা উচিত। কারণ আমরা কেবল কাপড় বানাই না, আমরা মানুষের স্বপ্ন বুনি আর সভ্যতাকে নতুন রূপ দেই।

পরের বার যখন প্রিয় পোশাকটা পরবেন, একটু আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসুন। কারণ ওই আয়নায় আপনি কেবল নিজেকে দেখছেন না, দেখছেন টেক্সটাইলের এক হাজার বছরের বিবর্তন আর আগামীর সম্ভাবনা! আমরা হয়তো শুধু পোশাক পরি, কিন্তু সেই পোশাকের প্রতিটি ভাঁজে মিশে থাকে আমাদের সংস্কৃতি আর পরিচয়। সুতোর মায়ায় আমরা জড়িয়ে আছি গতকাল, আজ আর আগামীর অনন্তকাল।

মানব জীবন ও আফসোস

(জিহাদ হোসাইন, ব্যাচ ৯, DTE)

মানব জীবন এক আশ্চর্য বৈচিত্র্যের নাম। এখানে সুখ আছে, আবার দুঃখও আছে কখনো পাশাপাশি, কখনো পরপর। সুখের জন্য যখন মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন অনেক সময় ভাগ্যে জোটে কেবলই দুঃখ। আর দুঃখে জর্জরিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষ তখন সুখের কল্পনাতেই শান্তি খোঁজে। এই চাওয়া পাওয়ার টানাপোড়েনেই বয়ে চলে আমাদের জীবন।

জীবনে কত কিছু চেয়েছি মনের মতো পাওয়ার তালিকায় আজও অনেক নাম লেখা বাকি। সেই কাগজে কলম ছোঁয়ানোর সাহস যেন এখনও হয়ে ওঠেনি। অথচ দুঃখের হিসাবের কাগজ বহু আগেই ভরে গেছে; সেখানে নতুন করে কিছু লেখার মতো আর একটুকু জায়গাও খালি নেই। নীরবে বসে তখন শুধু ভাবি অতীতে করা ভুলগুলো নিয়ে। কখনো কি পারব সেই ভুলগুলোর ভার নামিয়ে রাখতে? যদি পারতাম মাথার ভেতরের সব অস্থির চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে, হয়তো জীবনটা একটু সহজ হতো, একটু হালকা লাগত।

হায়াত এই জীবন আল্লাহর দেওয়া এক অমূল্য নিয়ামত। অথচ আমরা মানুষ নিজের করা ভুল, আক্ষেপ আর

অনুশোচনার ভারে সেই অমূল্য সময়টাই নষ্ট করে ফেলি। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, এই জীবনের প্রতিটি শ্বাসই একটি আমানত। আরও দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় সেই সৃষ্টিকর্তার প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি এই পুরো জগতের মালিক। অথচ আমাদের উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তাঁর গুণগান করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেকে নিয়োজিত করা। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু বাইরের কেউ নয় তার নিজের আফসোস। যখন মানুষ অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে, তখনই তার ভেতরে জন্ম নেয় অসন্তোষ। সেই অসন্তোষ ধীরে ধীরে মানসিক শান্তি গ্রাস করে ফেলে, মানুষকে আক্ষেপের ভারে নুয়ে দেয়।

যদি মানুষ অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন তুলনা না করত, যদি সৃষ্টিকর্তার দেওয়া নিয়ামতগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে শিখত তাহলে হয়তো তাকে এত দুঃখ আর আক্ষেপ বয়ে বেড়াতে হতো না। সন্তুষ্টির মাঝেই লুকিয়ে আছে শান্তি, সেই শান্তিই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

অদৃশ্য অস্তিত্ব

(আশিক মাহামুদ, ব্যাচ ১০, DTE)

মৃত্যুর পর মানুষ কীভাবে থাকে আমি তা জানি না। কিন্তু মানুষ বেঁচে থেকেও কীভাবে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়, সেটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি।

মানুষ হারিয়ে যায়- এই কথাটা আমরা খুব হালকাভাবে বলি। কিন্তু কেউ কেউ হারিয়ে যায় এমনভাবে, যে মনে হয় পৃথিবীর বুকে তাদের কোনো অস্তিত্বই কখনো ছিল না।

আমার পাশের বাসার লোকটা- নাম জানতাম না। প্রতিদিন সকালে একই সময়ে ঘর থেকে বের হতো, রাতে কখন যেন ফিরত। তবু বুঝতাম সে আছে, কারণ প্রতিদিন সকালে দরজার শব্দ হতো। জুতা পরার আওয়াজ। রাতে ফিরে এসে চাবি ঘোরানোর শব্দ। এই শব্দগুলোই ছিল তার পরিচয়।

কথা বলত না, তাকে আমি কখনো হাসতে দেখিনি। প্রতিদিন ফিরেই দরজাটা খুলেই ভেতরে ঢুকে পড়ত, যেন বাইরে সে একজন অন্যরকম মানুষ ছিল, আর ভেতরে ঢুকেই সে আরেকজন।

একদিন লক্ষ্য করলাম, তার দরজা আর খোলে না। কিন্তু ঘরের ভেতর আলো জ্বলে। রাতে জানালার ফাঁক দিয়ে ছায়ার উপস্থিতি দেখা যেত। পর্দা নড়ে, রান্নাঘর থেকে মাঝেমধ্যে গ্যাসের গন্ধ আসে। তবু মনে হয়- ঘরটা কাউকে ধারণ করছে না। যেন কেউ অনেক দিন ধরে নিজেকে ভাঁজ করে রেখেছে, এতটাই ভাঁজ করে নিয়েছে যে একসময় সে আর নিজেকে সেভাবে খুলতে পারেনি। মানুষ নেই, তবু উপস্থিতি আছে- এই অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। তিন দিন, চার দিন। কেউ খোঁজ নিল না। কারণ শহর এমন- এখানে অনুপস্থিতিও অস্বাভাবিক কিছু না, যেখানে সবাই সবার গল্প লিখতে ব্যস্ত, অন্যকে নিয়ে ভাবার আর সুযোগ কই।

পঞ্চম দিনে দরজাটা খুলে দিল পুলিশ। ভেতরে কেউ নেই। শরীর নেই, রক্ত নেই, চিৎকারের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু একটা ঘর- যেখানে জিনিসপত্র আছে, কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। বিছানায় ভাঁজ করা চাদর। টেবিলে অর্ধেক লেখা ডায়েরি, শেষ লাইনে থেমে গেছে। কথাটা শেষ হয়নি, যেন লেখার আগেই লেখক ফুরিয়ে গেছে। আয়নায় আঙুলের দাগ, যেন কেউ নিজেকে ছুঁয়ে দেখছিল যে সে আছে তো?

পুলিশ বলল, "মনে হয় লোকটা চলে গেছে।" তবে আমি জানি, এটা চলে যাওয়া নয়। এটা মুছে যাওয়া, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। শহরের বুকে শীত এসে যেমন আবার মিলিয়ে যায় খুব সহজেই, তেমনই হয়তো।

সেই দিন বুঝলাম- মানুষ সব সময় মরলে ভয়ংকর হয় না। কখনো কখনো সে বাঁচতে বাঁচতেই এমনভাবে গুটিয়ে যায়, প্রথমে কথা, তারপর ইচ্ছা, তারপর আবেগ,

শেষে- নিজেকেই। যে একসময় সে আর কোথাও থাকে না- না ঘরে, না স্মৃতিতে, না মানুষের মাথায়।
রাতে এখনো ঐ ঘরের দিকে তাকালে মনে হয়, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি জানি, সেখানে শুধু একটা শূন্যতা আছে। যে শূন্যতা আমাদের সবার ভেতরেই কোনো না কোনো সময় উঁকি দেয়।
আমরা শুধু অদৃশ্য হওয়ার অপেক্ষায় থাকি।

সূতোর বাঁধনে স্বপ্নের বুনন

(হারুন আর রশিদ, ব্যাচ ৯, DTE)

প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেছিলাম একরাশ কৌতূহল আর খানিকটা সংশয় নিয়ে । কানে বাজছিল শুধু একটি শব্দ - "টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং" । কেউ বলেছিল, "কাপড়ের সাবজেক্ট, এতে আবার ইঞ্জিনিয়ার হয় নাকি?" সেই ঠাট্টা মেশানো কথাগুলো প্রথম দিকে একটু দুলিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি প্রথম হাতে সুতো ধরলাম, সেই সংশয় কেটে গেল । বুঝলাম এটা কেবলই একগুচ্ছ সুতো নয়; এর প্রতিটি তন্তুর ভাঁজে লুকিয়ে আছে এক গভীর গল্প, এক দীর্ঘ ঐতিহ্য । এর পরতে পরতে মিশে আছে কৃষকের তুলা চাষের স্বপ্ন, শ্রমিকের অবিরাম ঘাম আর আমার নিজের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ । ড্রয়িং ফ্রেমে স্লাইভার যখন ছন্দময় গতিতে এগিয়ে চলে, তখন মনে হয় জীবনও তো এমনই । কখনও সুতোয় টান পড়ে, কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে ছিঁড়ে যায়, তবু সামনে এগোতেই হয় । প্রতিটি ভাঙা তন্ত্রকে জোড়া লাগিয়ে, নতুন করে শুরু করার সাহস নিয়েই তো আমরা পথ চলি ।
টেক্সটাইল শুধু একটি বিষয় নয়, এটি একটি শিল্প, একটি বিজ্ঞান, এবং একটি জীবনদর্শন । আমি যখন ফেব্রিক ডিজাইন ল্যাবে বসে নতুন প্যাটার্ন তৈরি করি, তখন কেবল কাপড়ের নকশা করি না; আমি যেন ভবিষ্যতের ফ্যাশন আর সংস্কৃতির ছক কষি । ডাইং প্ল্যান্টে রঙের ঘূর্ণিতে দেখি কিভাবে সাদা তন্ত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন আমাদের জীবনেও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা রঙ যোগ করে । আমি টেক্সটাইল পড়ি, কারণ আমি শুধু সুতো বুনি না; আমি স্বপ্ন বুনি । আমি জানি, এই সুতোর বাঁধনেই তৈরি হবে আগামী দিনের পোশাক, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি আর এক নতুন পৃথিবী । আমি এই সূতোর বাঁধনে আমার ভবিষ্যৎকে বুনতে শিখেছি, যেখানে প্রতিটি প্যাঁচ, প্রতিটি গিঁট আমাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে । এই পথচলায় প্রতিটি তন্তু, প্রতিটি ফেব্রিকে আমি আমার নিজের গল্প খুঁজে পাই ।

বিদ্রোহ

(সায়েম মেহেমুদ খান রোকন, ব্যাচ ১১, DTE)

অভয়ে জয়, তাকি অভয়ে হয়?
সেকি নির্ভীক সেজে কভু অভয়ে রয়।
চোখ জমিনে নয়, তার আকাশে রয়
সে রৌদ্রের তাপে পুড়ে জ্বালানি লয়।

তার করুণা হয়, তবু করুণা কয়
এই সত্যে জ্বলেপুড়ে করুণা হয়?
তোর হৃদয় ভয়, তবে জাতিতে নয়।
ওই জাতি পুড়ে আজ তোর জ্বালানি হয়।

সে জবাবে কয়, একি হৃদয়ে সয়
তা স্মৃতি থেকে মুছে যাবে কি করে হয়?
এই পুরনো ক্ষয়, আজও বাহুতে লয়
সে ফেটে চৌচির আজও বাহুতে হয়।

এক জমিনে নয়, শত জমিনে হয়
তবু রক্ত ঢেলে দেবো করিনা ভয়।
যদি করুণা হয়, তাও করুনা নয়
আমি বজ্রে ফেটে যাব আনিতে জয়।

জানি হৃদয়ে ভয়, তবে বাহুতে নয়
শত রক্তের জ্বালাপোড়া বাহুতে হয়।
আমি করিব ভয়, একি বাহুতে সয়
শত রক্তের মাটি চাপা স্মৃতিতে বয়।

সেই পশুরও মন, কত মারিলো জন
তা চোখ দিয়ে দেখেছি পুড়েছে মন।
সেই স্মৃতিরই সাজ, পুরে বাহুতে আজ
শত কবর খুঁড়েছি আমি পড়ে নামাজ।

আমি ফেটেছি আজ, তবে বলি সমাজ
তোরা ধিক্কার দিবি মোরে না জেনে রাজ।
তোর বাহুতে নাচ, আর রঙ্গিলা সাজ
তুই ধিক্কার দিবি মোরে হেনা সমাজ(মেহেদী পরা সমাজ)???

যে হৃদয়ে ঝং, আর বাহুতে রং
সে দুঃখ অনুভবে কাঁদিবে সং???
তোর বাহুতে ঢং, আর নারীরই রঙ
তবে পুরুষ হয়ে তুই জাতিরই পং (দুর্গন্ধ)।

তোর মেয়েলি সাজ, আর মাটিতে লাজ
তুই ধিক্কার দিবি মোরে হেনা সমাজ??

রেখে মাটিরও লাজ, দিয়ে বীরেরও সাজ
আমি ধিক্কার দেই তোরে হেনা সমাজ।

এই কথারই জয়, শুনে করুণা কয়
তোর রক্তের পোড়া মনে মরিছে ভয়।
আমি করুণা ভয়, পুড়ে হইবো ক্ষয়
মোরা রক্তের মরুপানে আনিব জয়।

অভয়ে জয়, তা কি অভয়ে হয়?
সে কি নির্ভীক সেজে কভু অভয়ে রয়?
চোখ জমিনে নয় তার আকাশে রয়
সে রৌদ্রের তাপে পড়ে জ্বালানি লয়।

তার অতীতে ভয়, তবে বাহুতে নয়
সেই স্মৃতি অগ্নির তাপ জ্বালানি হয়।
তার হৃদয়ে ক্ষয় তবে ভয়েতে নয়
তা শত্রুর গর্দানে আনিতে জয়।

তার করুণা হয়, তবু করুণা কয়
এই সত্যে জ্বলে পড়ে করুণা হয়???
আজ করুণা হয়, তবে করুনা নয়
আজ গর্দান গুনিলে কমিবে ক্ষয়।

Dyeing with Bubbles?

How Nanobubble Technology Could Transform Sustainable Textile Colouration

(Mehbuba Manir Nova, Lecturer, DTE)

The textile industry is one of the largest consumers of water and, unfortunately, one of the major contributors to water pollution. Conventional dyeing processes require huge volumes of water, dyes, salts, and auxiliary chemicals, much of which eventually becomes wastewater. As sustainability becomes an urgent global priority, the question arises: can we colour fabric without consuming excessive water? An emerging answer lies in something incredibly small — nanobubbles.

Nanobubbles are ultra-tiny gas bubbles, less than one micrometer in diameter. Unlike ordinary bubbles that quickly rise and burst, nanobubbles remain stable in liquid and possess unique properties such as high surface charge, large specific surface area, and elevated internal pressure. These characteristics enhance mass transfer efficiency and allow better interaction between dye molecules and textile fibres, even in systems where water usage is extremely low. In nanobubble-assisted dyeing, dye particles dissolve in a minimal amount of water and nanobubbles are generated through a jet sys-

tem. Dye molecules accumulate around the surface of these tiny bubbles, which then help transport the dye effectively into the fibre structure. Remarkably, this process can operate at an ultra-low liquor ratio of 1:1, meaning almost equal amounts of fabric and water. Compared to conventional dyeing systems that often use much higher liquor ratios, this represents a significant reduction in water consumption.

Research findings are promising. Studies on cotton dyed with reactive dyes have shown uniform colouration with comparable fastness properties while drastically reducing water, energy, and chemical use. In some cases, such as recycled cotton blended with chitosan, improved colour strength has even been reported due to enhanced dye attraction. However, certain applications, particularly with natural dyes, have shown slightly lower shade depth and wash fastness. These limitations are mainly linked to restricted dye migration under minimal water conditions, indicating that further process optimisation is necessary.

Despite these challenges, nanobubble technology offers an exciting pathway toward sustainable textile colouration. By relying on smart physical and chemical interactions rather than excessive resource consumption, this approach redefines how we think about dyeing. For countries with large textile industries and growing environmental concerns, such innovation could be transformative. Sometimes, meaningful change does not come from using more resources, but from reimagining the process itself — and in this case, a tiny bubble may hold the key to a more sustainable future.

এখন জুলাই!

(মাহাদি হাসান, ব্যাচ ১১, DTE)

জনসমুদ্র আজ উত্তাল বেগে মোহনা খুঁজেছে শেষে,
ন্যায়ের তটিনী গর্জে উঠেছে শৌর্যের পরবেশে।
অসতের ঐ তখত-তাউস টলমল আজ ভয়ে,
তারুণ্য আজ শপথ নিয়েছে সত্য, শুভ্র-ন্যায়ে।
বিদ্রোহী পথে পদচিহ্ন আঁকে অকুতোভয় যত প্রাণ,
শৃঙ্খল ভাঙার উৎসবে আজ মুখরিত আসমান।
হায়েনার দল আতঙ্কে বিভোর,গুনছে মরণ-ঘানি,
গণগোর খুঁড়ে হার মেনেছে ঐ পাপিষ্ঠদের গ্লানি।
শত তরুণের বুকের রক্তে ভিজেছে মাটির বুক,
কুকুর সেনারা ধন্য করেছে শোষকের রাঙা মুখ।
স্বার্থের তরে দেশ বিকিয়েছে চাটুকারের ঐ দল,
তারই প্রতিবাদে জেগেছে এবার প্রলয় অগ্নিনল।
পচা জঞ্জাল হয়ে যাক সাফ দেশ সংস্কারের তরে,
বিপ্লবী মন মশাল জ্বেলেছে প্রতি বাঙালির ঘরে।
ভীত সন্ত্রস্ত রক্তপিশাচ পালাবার পথ খুঁড়ছে,
আকাশের ঐ নীল ছাড়িয়ে বিজয়-কেতন উড়ছে!

(মাফিহা আক্তার, ব্যাচ ১১, DTE)

ক্ষমতা, নিপীড়ন ও জাগরনের কন্ঠ

(মোঃ সাকিবুল হাসান, ব্যাচ ১৩, DTE)

ইতিহাসে শুধু ক্ষমতারই পালাবদল,
প্রতিশ্রুতির পাহাড়—বাস্তবে চাপাবাজির দল।
স্বাধীন দেশে মানুষের স্বপ্ন ছিল উজ্জ্বল,
কিন্তু ক্ষমতার লোভে শাসনের নামে লুটপাট—
জনতার ভবিষ্যৎ হয় অনুজ্জ্বল।
জুলাইয়ের আগুনে জ্বলে উঠেছিল রাজপথ,
নীরব শহর কেঁপেছিল প্রতিবাদের শপথে।
ছাত্র-জনতার কণ্ঠে ছিল সাহসের আগুন,
আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ—শত শহীদের রক্তে
আজ স্বৈরাচারের পতন।
ন্যায়ের দাবিতে যখন জনতা নামে সংগ্রামে,
স্বৈরাচার খুনি হাসিনা পালায় ভয়ে ভারতে।
ক্ষমতায় থাকলে করতে হয় গোলামি,
আর প্রতিবাদ করলে—রাস্তা হয় শহীদি।
আবরার ফাহাদ শুধু একটি নাম নয়,
সত্য বলার অপরাধে নিভে যায় জীবনের আলো।
প্রতিবাদী কণ্ঠের আরেক প্রতীক—
নাথ, **ওসমান, হাদি**—
ভারতের আধিপত্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী,
প্রতিবাদ করলেই তারা করে দমন, হত্যা, নিষ্ঠুরতা।
ইতিহাস বলে—অন্ধকার কখনো স্থায়ী নয়,
জনতার শক্তি অমর, অদম্য, অক্ষয়।
তাই **ওসমান, হাদীর** মতো ভাইয়েরা
সময়কে বদলায়,
বাঙালির অন্তরে অন্তরে জায়গা করে নেয়।
শিশু মানেই হাজারো স্বপ্ন, কোমল ও পবিত্র,
তাদের ওপর নির্যাতন—মানবতার বিরুদ্ধে চিত্র।
হোক সে ভিক্ষুক, হোক সে বিশ্বনেতা—
সত্যিকারের শাসন হোক নারী ও শিশুর নিরাপত্তা।
দেশ ও বিশ্ব বাঁচুক ন্যায়ের আলোয়,
লুটপাট নয়, ক্ষমতার লোভ নয়,
নির্বাচনী নিপীড়ন নয়—
মানুষই হোক রাষ্ট্রের পরিচয়।

মৌসুমি সখ্য: মোটিভ ৭৮৬

(ইজানা আক্তার মিম, ব্যাচ ৮, DTE)

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই ইরা বুঝেছে সে বড্ড একা, অনাথ একটা মেয়ে। বাবার মৃত্যুতে চারপাশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে তার জন্য। প্রথমদিকে আশেপাশের মানুষের ব্যবহারে সে চমকে উঠেছে, থমকে গিয়েছে। এখন আর খুব সহজে চমকে উঠে না, থমকে যায় না।

নির্বিকার দিন কাটানোর মাঝেই হঠাৎ তার ঠিকানায় এক আগন্তুকের চিঠি। ইরার বিষাদময় এবং একঘেয়েমি জীবনটায় এবার যেন রহস্যের বাক্স উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। খাম খুলে ১ম পৃষ্ঠায় দেখতে পেল বড় অক্ষরে লেখা 'মৌসুমি সখ্য'। ইরা ভাবল তার তো এখন চিঠি পাওয়ার কথা না। ২য় পৃষ্ঠা পড়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেলো। রহমান সাহেব ইরার বাবা না এই ব্যাপারটা ইরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেনা। এতটুকু পড়েই তার মাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে। তার মা লা জবাব ছিলো। অথচ এখন শুনছে এই ভদ্রমহিলাও ইরার মা নয়।

কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে লিডার নদীর তীরে পাহেলগাম অঞ্চলই ইরার জন্মস্থান। লঞ্চ প্যাডে অবস্থিত মুজাহিদ দলের আমীরের মেয়েই হচ্ছে ইরা। আর সেই মুজাহিদ দলের সক্রিয় সদস্য হলো রহমান সাহেব।

ইরার মাথাটা অসম্ভব ধরেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠা পড়ার আগে এককাপ চা খেলে ভালো লাগতো। এতো রহস্য

ইরা একসাথে নিতে পারছে না। কে এই আমীর! তাকে কেনো রহমান সাহেবের কাছে দিয়ে দিলো! কি হয়েছিলো পাহেলগামে! এই সবকিছু জানার জন্য তাকে পাহেলগামে যেতে হবে। শেষ পৃষ্ঠায় আলফা নিউমেরিক কোড দেওয়া।

জিপিএস কোড: ৩৮.০৬

আইডেন্টিটি: ৭৮৬

ঠিকানা: জুরাইন

পুরান ঢাকার জুরাইনে ইরা কে যেতে হবে এখুনি। সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। বের হওয়ার সময় বুঝতে পারল তার পেট ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছে। সকাল থেকে কোনো দানা পানি পড়ে নি পেটে। ইরা পেটভরে খেয়ে বাড়ি থেকে বের হলো। মরীচা ধরা লোহার গেইট খুলে বাড়ির বাহিরে পা বাড়াতেই শরীর কেঁপে উঠলো তার। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। তার শৈশব কৈশোর তো এই বাড়িতেই। এটাই তো তার সব ছিলো। এখানে কি আর কখনো আসা হবে তার!

রিক্সায় উঠেই দোতলা শ্যাওলা রং উঠা বাড়ির দিকে একবার তাকালো। ভেঙে পড়লে তো তার চলবে না। ছুটতে তাকে হবেই। রাজ্যের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার ভিতরে। জুরাইনে কি হতে চলেছে, জুরাইনে কে আসবে? তার বায়োলজিকাল বাবা নাকি তার পুরো পরিবার নাকি মুজাহিদ দলের কেউ। কাউকে কথাগুলো বলতে পারলে ভালো হতো। রিক্সা তার আপন গতিতে চলছে রহস্যের গন্ধ মাথায় করে। ইরার জীবন তাকে গন্তব্যহীন প্রশ্নের উত্তরের অসীম সম্ভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জুরাইনের সেই নির্দিষ্ট গলিটায় ঢোকার পর ইরা দেখল চারপাশটা একদম নিঝুম। জিপিএস কোড অনুযায়ী সে একটা পুরনো কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। তার পরনে কাশ্মীরি ধাঁচের ফেরান। তিনি ইরাকে আপাদমস্তক দেখে এক অদ্ভুত মায়াবী হাসলেন।

বৃদ্ধা নিচু স্বরে বললেন, "সবাই তো আর নিজের ঠিকানা খুঁজে পায় না, তুমি পেয়েছ। ভেতরে আসবে, নাকি বাইরের এই জগতটাকেই সত্যি বলে ধরে নেবে?"

ইরা এক পা বাড়াল। তারপর কী মনে করে থমকে দাঁড়াল। সে কি ভেতরে ঢুকে নিজের আসল পরিচয় জানবে, নাকি আজন্মের চেনা রহমান সাহেবের মেয়ে হয়েই বেঁচে থাকবে?

তাঁতের ছন্দে দিনযাপন

(সাদিয়া নাহিয়ান, ব্যাচ ১০, DTE)

ভোরের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। পূর্ব আকাশে সূর্যের আলো উঠতে না উঠতেই গ্রামবাংলার কোনো এক উঠোনে ভেসে আসে পরিচিত এক শব্দ—খটখট... খটখট...। এ শব্দ শুধু তাঁতের নয়, এ শব্দ এক জীবনের, এক ঐতিহ্যের, এক অবিচ্ছিন্ন সময়ধারার।

একজন তাঁতী যখন তাঁতের সামনে বসেন, তাঁর কাছে সুতা শুধু উপকরণ নয়—এটি তাঁর ভাষা। মাটির ঘরের কোণে রাখা রঙিন সুতো যেন অপেক্ষা করে থাকে গল্প হয়ে ওঠার। লাল, নীল, সাদা, হলুদ—প্রতিটি রঙ যেন গ্রামবাংলার আলাদা আলাদা অনুভূতি বহন করে। কখনও তা পাকা ধানের ক্ষেত, কখনও নদীর জল, কখনও কাশফুলের সাদা ঢেউ।

সুতা পাক খেতে খেতে শক্ত হয়, আর তাঁতের কাঠের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে তৈরি করে বুননের ছন্দ। এই ছন্দে লুকিয়ে থাকে এক অদ্ভুত ধৈর্য। একটি কাপড় শেষ হতে সময় লাগে, কিন্তু সেই সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মিশে থাকে শ্রম, মনোযোগ আর ভালোবাসা। তাঁতীর পায়ের তাল, হাতের টান, চোখের হিসাব—সব মিলিয়ে যেন এক নীরব সংগীত।

গ্রামের মানুষদের জীবনে তাঁত শুধু পেশা নয়, এটি উত্তরাধিকার। বাবার কাছ থেকে ছেলে, মায়ের কাছ থেকে মেয়ে—এই শিল্প চলে আসে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। একটি শাড়ির নকশা হয়তো নতুন, কিন্তু তার ভেতরের কৌশল

বহু পুরোনো। এভাবেই সুতা হয়ে ওঠে স্মৃতির বাহক। তাঁতঘরের ভেতরে আলো কম, কিন্তু স্বপ্নের অভাব নেই। প্রতিটি বোনা কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আশা—হাটে ভালো দামে বিক্রি হবে, সংসারে স্বস্তি আসবে, সন্তানের পড়াশোনা চলবে। একটি সুতো ছিঁড়ে গেলে যেমন বুনন থেমে যায়, তেমনি জীবনের ছোট ছোট বাধাও এই মানুষগুলোর পথ রোধ করে। তবু তারা থামে না। আবার সুতো জোড়া লাগে, আবার তাঁত চলে।

এই বোনা কাপড় শহরের বাজারে গিয়ে হয়তো হয়ে ওঠে ফ্যাশন, হয়ে ওঠে নকশার বিস্ময়। কিন্তু তার ভাঁজে লুকিয়ে থাকে গ্রামের সকাল, কুয়াশা, মাটির ঘর আর এক তাঁতীর নিঃশব্দ স্বপ্ন।

সুতা ও তাঁত তাই কেবল বস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি নয়। এরা গ্রামবাংলার হৃদস্পন্দন। এরা বলে দেয়—শ্রম কখনও নিঃশব্দ হলেও মূল্যহীন নয়। একটি কাপড় শুধু শরীর ঢাকে না, এটি জড়িয়ে রাখে মানুষ, মাটি আর ইতিহাসকে। গ্রামের সেই ভোরবেলার খটখট শব্দ আজও জানান দেয়—বাংলার গল্প এখনো সুতোয় সুতোয় বোনা হচ্ছে।

Textile Blunders - Mistakes That Cost Millions

(আল আমিন ইসলাম, ব্যাচ ১২, DTE)

টেক্সটাইলে অনিচ্ছাকৃত ভুল অথবা বিভিন্ন সেকশনে (স্পিনিং, উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, গার্মেন্টস) কাজ করার সময় অনেক সময় ছোট বা বড় ভুল হয়, যেই ভুল গুলোর কারণেকাপড়ের কোয়ালিটি খারাপ হয়, কাপড়ের কস্ট বাড়ে, ডিফেক্ট তৈরিহয়, রিজেকশন হয় এই ধরনের ভুলগুলোকেবলা হয় textile blunders। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিএমন একটি ক্ষেত্র যেখানেএকটি ছোট ভুল থেকেও বড় লস হতে পারেএবং পুরো প্রোডাকশন নষ্ট করেদিতেপারে।

প্রতিটি টেক্সটাইল স্টুডেন্টদের এই বিষয়ে সঠিকভাবে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। টেক্সটাইল ব্লান্ডারস স্টুডেন্টদের শেখায় প্রোডাকশন কোথায় ভুল হয়, কেন ভুল হয়, ভুল হলে কী কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এসব ছোট ভুল থেকেই হয় buyer rejection, reprocessing cost ও reputation loss। এই ভুল গুলো সম্পর্কে জানলে লক্ষ লক্ষ টাকা লস থেকে বাঁচা সম্ভব। টেক্সটাইল ব্লান্ডারস সম্পর্কে স্টুডেন্টরা জানলে তারা সহজেই defect চিনতে শিখবে। এটা স্টুডেন্টদের Decision making skill বাড়ায় এবং কখন production থামাতে হবে আর কখন reprocess করা দরকার সেই সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। ভুল সম্পর্কে জানা মানে ভয় পাওয়া নয় বরং ভুল জানা মানে ভবিষ্যতে সেই ভুল না করা। আজকের সচেতন স্টুডেন্টই আগামীর সফল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার।

Spinning Section Blunders

স্পিনিং সেকশন হলো টেক্সটাইল প্রসেসের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এখানে ছোট ভুল হলেপরে weaving এবং dyeing করতে সমস্যা হতে পারে।

১. Wrong Twist Level থেকে yarn Breakage: twist হলো সুতায় দেয়া পাক যা ফাইবার গুলোকে একসাথে ধরে রাখে। প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি twist দিলে এবং yarn count অনুযায়ী twist ঠিক না করলে ভুল হয়। twist কম হলে সুতা দুর্বল হয় বারবার ছিড়ে যায় এবং twist বেশি হলে সুতা শক্ত হয়। twist ভুল হলেই production কমে যায়, Final fabric-এ defect আসে।

২. Improper Carding Setting থেকে Neps Problem: কার্ডিং হলো ফাইবারকে পরিষ্কার ও আলাদা করার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ভুল হলে ফাইবারে ছোট গিট তৈরিহয় যা সুতা ও কাপড়ে স্পষ্ট দাগ তৈরি করে।

৩. Fiber Mixing Mistake (Cotton + Polyester Ratio): ফাইবার মিক্সিং হলো cotton ও polyester নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে yarn তৈরি করা। বেল ম্যানেজমেন্ট ঠিক না রাখলে, ঠিকভাবে ব্লেন্ড না করলে এবং রেশিও ভুল নিলে ফাইবার মিক্সিং এ সমস্যা হয়। বায়ার নির্দিষ্ট রেশিও অনুযায়ী অর্ডার দেয় তাই যদি রেশিও মিসমেচ হয় তাহলে পুরো প্রজেক্ট রিজেক্ট হতে পারে।

Weaving & Knitting Mistakes

এই সেকশনে ছোট ভুল হলে ফ্যাব্রিকের strength, quality নষ্ট করে দিতে পারে।

১. Wrong Warp Tension: Warp yarn-এ দেওয়া টানকে warp tension বলে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম tension দিলে এবং সবগুলো warp yarn এ সমান tension না থাকলে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। যেমন বেশি tension দিলে warp breakage হয় আবার কম tension দিলে loose fabric হয়। warp tension ঠিক না থাকলে loom efficiency কমে যায় এবং fabric appearance নষ্ট হয়।

২. Incorrect Loom Speed: loom speed হলো প্রতি মিনিটে loom কয়টা PPM (picks per minute) দেয়। ফ্যাব্রিকের টাইপ না বুঝে স্পিড বাড়ালে এবং yarn strength অনুযায়ী স্পিড ঠিক না রাখলে এই সেকশনে ভুল হয়। মনে রাখতে হবে বেশি স্পিড মানেই বেশি প্রোডাকশন নয় বরং ভুল স্পিড মানেই বেশি defect।

৩. Needle Selection Error in Knitting: knitting এ ব্যবহার করা needle এর গজ, সাইজ ও টাইপ সরাসরি ফ্যাব্রিকের উপর প্রভাব ফেলে। yarn count অনুযায়ী নিডল এর সাইজ না ঠিক করলে এবং ভুল গজ নির্বাচন করলে এক্ষেত্রে ভুল হয়। নিডলে ভুল হলে ফ্যাব্রিক defect সহজে ঠিক করা যায় না এবং পুরো রোল বাতিল হয়ে যেতে পারে।

Dyeing Disasters

ডাইং সেকশনকে টেক্সটাইলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ বলে। এইক্ষেত্রে সামান্য ভুল হলে সম্পূর্ন ব্যাচ রিজেক্ট হতে পারে।

১. Shade variation: একই রঙের কাপড়ে ভিন্ন জায়গায় রঙের পরিবর্তন (গাড়-হালকা) হওয়াকে shade variation বলে। এটা হয় dye ঠিকমতো dissolve না হলে এবং ব্যাচ টু ব্যাচ প্যারামিটারের পার্থক্য থাকলে। সেইসাথে dyeing এর সময় সমান না রাখলে। এর ফলে re-dye বা rejection হয় এবং বায়ারের shade কার্ডের সাথে মিলেনা।

২. Incorrect pH Control: pH খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। pH dye ফাইবারের রিজেকশন নিয়ন্ত্রণ করে। এসিড বা এলকাইল এর পরিমাণ ভুল দিলে এবং washing স্টেজে pH চেক না করলে ভুল হয়। যার ফলে শেড বদলে যায় এবং ফাইবার নষ্ট হয়ে যায়।

৩. Wrong Temperature Profile: ডাইং চলাকালে তাপমাত্রা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কম বা বেশি করাকে temperature profile বলে। হঠাৎ করে তাপমাত্রা কম বা বেশি দিলে ফ্যাব্রিকের ক্ষতি হতে পারে। ফলে ফ্যাব্রিক হার্শ ফিল করে এবং strength লস হয়।

৪. Overdye: যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি রঙ বসলে overdye হয়। dye এর পরিমাণ ঠিক না থাকলে এবং bath রেশিও ঠিক না থাকলে overdye হয়। এর ফলে ফ্যাব্রিক রিজেক্ট হয়, কালো patches হয়।

Printing & Finishing Blunders

এই সেকশন হলো ফ্যাব্রিকের ফাইনাল appearance নির্ধারণ করার ধাপ। এই সেকশনে কোন ভুল হলে আগের ভালো কাজ গুলোও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১. Print misalignment: কাপড়ের উপর সঠিক জায়গায় প্রিন্ট না বসলে তাকে print misalignment বলে। এটা হয় ঠিক ভাবে ব্লক সেট না করলে, মেশিন ভাইব্রেট করলে, ফ্যাব্রিকের ফিডিং অসমান হলে। এর ফলে ডিজাইন বেঁকে যায় এবং প্যাটার্নে গ্যাপ তৈরি হয়। ফাইনাল ডিজাইনে ভুল হলে বায়ার প্রোডাক্টটি আর নিতে চান না।

২. Color bleeding after wash: ওয়াসিং এর পর রঙ ছড়িয়ে পড়লে তাকে color bleeding বলে। dye ঠিকভাবে না বসালে, দুর্বল কোয়ালিটির dye ব্যবহার করলে এবং ভুল ওয়াসিং সিকুয়েন্স মানলে color bleeding হয়। এর ফলে বায়ারের কমপ্লেন্ট আসে ও প্রোডাক্ট রিটার্ন আসে।

৩. Over-Softening থেকে GSM Loss: ফ্যাব্রিক নরম করার জন্য softener বেশি ব্যবহার করাকে over-softening বলে। ভুল softening ব্যবহার করলেও ফিনিশিং এর সময় বেশি রাখলে over softening হয়। এর ফলে ফ্যাব্রিক অতিরিক্ত লাইট হয়ে যায়, GSM কমে যায়, ফ্যাব্রিকের strength ও durability কমে যায়। GSM buyer requirement অনুযায়ী না হলে সম্পূর্ন লট রিজেক্ট হতে পারে।

How To Avoid Textile Blunders

স্পিনিং সেকশনে yarn count অনুযায়ী twist লেভেল ঠিক রাখা। প্রতিনিয়ত yarn testing করা। বেল ম্যানেজমেন্টে সঠিক ব্লেন্ডিং করা। ফলে সুতা নষ্ট হবে কম, neps কম হবে, শক্ত সুতা পাবো।

Weaving & knitting সেকশনে warp tension সবগুলো yarn এর মধ্যে সমান ভাবে রাখতে হবে।

ফ্যাব্রিকের কোয়ালিটি অনুযায়ী লুম স্পিড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সঠিক নিডল সিলেক্ট করতে হবে। damaged needle সময়মতো বদলাতে হবে। ফলে ফ্যাব্রিকের সারফেস ভালো হবে, ফ্যাব্রিকের defect কমবে।
Dyeing সেকশনে সঠিক dye এবং pH নিয়ন্ত্রণ এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাপমাত্রা কম বা বেশি দেয়া যাবে না।
Finishing & printing সেকশনে সঠিকভাবে ডিজাইন সাজাতে হবে। dye ভালোভাবে বসাতে হবে। GSM ঠিকভাবে আছে কিনা তা ফিনিশিং এর পর দেখাশোনা করতে হবে। সঠিক softener ব্যবহার করতে হবে। ফলে পরিষ্কার প্রিন্ট পাবো, ফ্যাব্রিকের কোয়ালিটি ভালো পাবো এবং স্টেবল GSM পাবো।
প্রতিটি সেকশনের এই ব্লান্ডারস গুলো ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে বড় বড় লস গুলো এড়িয়ে চলা সম্ভব। Textile Blunders এড়ানো মানে শুধু ক্ষতি কমানো সেটা নয় বরং এটা quality, buyer trust ও professional growth নিশ্চিত করে।

ফ্যাশন ও শিল্পখাতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভূমিকা

(সালওয়া মুক্তাদির লামিয়া, ব্যাচ ১২, DTE)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শুরু করার পর বস্ত্রকে আর শুধু পোশাক হিসেবে দেখা যায় না। ফাইবার থেকে শুরু করে সুতো, কাপড় এবং তার চূড়ান্ত ব্যবহার-এই পুরো প্রক্রিয়াটি একটি প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা। বস্ত্রশিল্প মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন শিল্প হলেও আধুনিক যুগে এটি একটি দ্রুত বিকাশমান ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পরিণত হয়েছে। ফ্যাশন শিল্প থেকে শুরু করে চিকিৎসা, নির্মাণ, পরিবহন ও প্রতিরক্ষা-প্রায় সব ক্ষেত্রেই বস্ত্রের ব্যবহার রয়েছে।
বর্তমান বিশ্বে বস্ত্রশিল্পকে একটি মৌলিক শিল্প হিসেবে ধরা হয়, কারণ এটি সরাসরি অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী হিসেবে এই শিল্পের বিস্তৃতি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্যাশন শিল্পে বস্ত্র ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং:
ফ্যাশন খাতে বস্ত্রের ভূমিকা সবচেয়ে পরিচিত হলেও এর পেছনের ইঞ্জিনিয়ারিং দিক অনেক সময় আড়ালেই থেকে যায়। একটি পোশাক তৈরি হওয়ার আগে ফাইবার নির্বাচন, সুতো প্রস্তুতকরণ, ফ্যাব্রিক স্ট্রাকচার এবং ফিনিশিং-এই প্রতিটি ধাপেই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োগ থাকে।
প্রাকৃতিক ফাইবার যেমন তুলা, উল বা সিল্ক এবং কৃত্রিম ফাইবার যেমন পলিয়েস্টার বা নাইলনের ব্যবহার নির্ভর করে পোশাকের উদ্দেশ্যের ওপর। কাপড়ের GSM, বুনন পদ্ধতি এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়াই ঠিক করে দেয় একটি পোশাক কতটা আরামদায়ক বা টেকসই হবে।
ফ্যাশন শিল্পের সাথে বস্ত্রশিল্পের অর্থনৈতিক সম্পর্কও গভীর। বাংলাদেশ একটি বড় উদাহরণ, যেখানে তৈরি পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। এই শিল্প লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং বৈশ্বিক বাজারে দেশের অবস্থান শক্তিশালী করেছে।

আধুনিক টেক্সটাইল প্রযুক্তি
প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে টেক্সটাইল শিল্পেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন শুধু সাধারণ কাপড় নয়, বরং বিশেষ গুণসম্পন্ন স্মার্ট টেক্সটাইল তৈরি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, এমন পোশাক তৈরি করা হচ্ছে যা পরিধানকারীর হৃদস্পন্দন বা স্বাস্থ্যগত তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ন্যানোপ্রযুক্তির মাধ্যমে কাপড়কে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বা পানি প্রতিরোধী করা সম্ভব হচ্ছে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য ফাইবার ও বায়োডিগ্রেডেবল টেক্সটাইলের ব্যবহারও বাড়ছে। 3D বয়ন ও উন্নত নিটিং প্রযুক্তি উৎপাদনকে আরও দক্ষ করে তুলছে। এই পরিবর্তনগুলো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে।
টেকসইতা ও বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ
বস্ত্রশিল্পের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো টেকসইতা। অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, রাসায়নিক রং এবং বর্জ্য সমস্যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। দ্রুত ফ্যাশনের কারণে অল্প সময় ব্যবহৃত পোশাক ফেলে দেওয়া হয়, যা পরিবেশ দূষণ বাড়ায়।

এই সমস্যার সমাধানে টেকসই উৎপাদন পদ্ধতির দিকে ঝোঁক বাড়ছে। জৈব তুলা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পলিয়েস্টার, পানি সাশ্রয়ী ডাইং এবং সার্কুলার ফ্যাশন ধারণা এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে এই বিষয়গুলো বোঝা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োগ করা আমাদের দায়িত্ব।

বস্ত্র ও সংস্কৃতি

বস্ত্র একটি দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। বাংলাদেশের জামদানি ও নকশিকাঁথা কেবল ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র নয়, এগুলো আমাদের ইতিহাস ও শিল্পচেতনার প্রতীক। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

সব দিক বিবেচনায় বলা যায়, বস্ত্রশিল্প একটি বিস্তৃত ও বহুমুখী ইঞ্জিনিয়ারিং খাত। ফ্যাশন থেকে শুরু করে শিল্প, চিকিৎসা, কৃষি এবং পরিবেশ-সব ক্ষেত্রেই এর ভূমিকা রয়েছে। একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী হিসেবে এই শিল্পের দায়িত্ব ও সম্ভাবনা দুটিই আমাদের বুঝতে হবে।

বস্ত্র শুধু কাপড় নয়; এটি প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের একটি সমন্বিত রূপ, যা ভবিষ্যতেও মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি হাদি বলছি

(সায়েম মেহেমুদ খান রোকন, ব্যাচ ১১, DTE)

দেখো দেখো সেই
অক্ষি কৌটে রক্ত ঝরছে,
শত শত লাশের মনকে
তারায় গুনছে।

দেখো দেখো আকাশ
বজ্র বাতাস ছিঁড়ছে,
শত শত লাশের গন্ধে
আকাশ চিড়ছে।

বলো বলো আমার রক্ত
কজন গুনবে,
শোনো শোনো আমার রক্ত
স্লোগান বলবে।

বলো বলো আমার রক্ত
মুক্তি ডাকছে
শোনো শোনো তোমার রক্ত
বারুদ ছুটছে।

ডাকো ডাকো নিজের মনকে
বিজয় আনতে,
বল বল আমার রক্ত
বিজয় আনবে।

বেঁচে বেঁচে কত কালযে
ময়ূর সাজবে?
বলো বলো মরণ আনবো
দেশের স্বার্থে।

দেখো দেখো আমি লাশযে
কথা বলছি,
শোনো শোনো আমার রক্ত
আগুন চিমনি।

দেখে দেখে ময়ূর নৃত্য
সময় গুনছি,
বল বল কখন ফাটবে
তোমার চিমনি।

আসো আসো আমার মৃত্যু
স্লোগান তুলবে,
বল বল তোমার মৃত্যু
আগুন জ্বালবে।

আমি আমি দেশের জন্য
তোমায় ডাকছি,
ধরো ধরো দেশের জন্য
শাবল, কাস্তি।

শোনো শোনো মানুষ নামকে
লাশে ডাকছে,
দেখো দেখো কাফন ছিঁড়েছে
দাফন করছে।

কত কত মায়ের মনকে
উজাড় করল,
বল বল তোমার মন কি
তাতেয় নড়লো।

আমি আমি লাশের গন্ধ
তোমায় ডাকছি
তুমি তুমি বধির অন্ধ
আমি ই মানছি।

শুঁকে শুঁকে আমার গন্ধ
আকাশ গর্জে,
থেমে থেমে আমার দুঃখে
আকাশ বর্ষে।

শোঁঙ্গো শোঁঙ্গো আমার গন্ধে
বাতাস বলছে,
ডেকে ডেকে মরণ ভয়কে
দাফন করতে।

ধরো ধরো আমার রক্ত
দাফন হচ্ছে,
মারো মারো আমার রক্ত
মলিন করছে।

চলো চলো দেশের স্বার্থে
মরণ ডাকতে,
বল বল জীবন ঘাটকে
শ্মশান করতে।

আমি আমি মরণ শান্তি
জীবন প্রান্তে,
ধীরে ধীরে তোমায় ডাকছি
লাশের গন্ধে।

দেখো দেখো খোদা ডাকছে
ভালো বাসতে,
আসো আসো দেশের জন্য
জীবন প্রান্তে।

"কাপড় রঙিন, জীবন কেন সাদা-কালো?"

(শামসুজ্জোহা সিজান, ব্যাচ ১২, DTE)

বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্প বিশ্বের কাছে শুধু একটি পোশাক-উৎপাদন ক্ষেত্র নয়-এটি কোটি মানুষের জীবনধারণের মাধ্যম, আর দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি । ফ্যাকটরির কাজে চাপ, গরম পরিবেশ, ধুলা-বালি, দাড়িয়ে দাড়িয়ে দিনের পর দিন কাজ করে যাওয়ার পরও প্রায়ই অবহেলার স্বীকার হয়ে থাকে টেক্সটাইল এবং গামর্মেন্টস শ্রমিকেরা । শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কার্যকর হচ্ছে এমন দুর্লভ । শ্রমিকের প্রয়োজনকে অপ্রয়োজনীয় দাবি, কোম্পানির সাধ্যের বাহিরে এমন গুঁজামিল দিয়ে মালিক-শ্রমিক ব্যবধান বেড়েই চলছে ।

মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রয়োজন তা বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতনের যথাযথ না । বাহিরের দেশে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের পরিশ্রম কিছুটা কম হলেও বতেন আকাশ ছোঁয়া, কিন্তু আমার দেশের উন্নত প্রযুক্তি নাই শ্রমিকের দক্ষতা সামান্য টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় । বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সাথে সাথে তাদের ঘর ভাড়া, দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দামের ইনক্রিমেন্ট পায়। তাদের আয়ের উন্নতি হয় না, জীবনের ও না । যে পোশাক তাদের হাতে তৈরি, সেই হাতে পোশাক ক্রয় করার সামর্থ্য থাকে না । সারাদিনের শ্রম, ক্লান্তি, দায়িত্ব পালনের পর নিজের সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করা হয়ে উঠে না ঠিকভাবে । যার ফলে আজকের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে মা-বাবার স্নেহ মমতার। টেক্সটাইলে ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবন সাদা-কালে ছবির মতো, কখনো রঙিন হবে কি??

যত কষ্টই থাকুক-বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করেন দক্ষতা, নিষ্ঠা, আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে । কোমল সুতোকে টেনে, ভেঙে যাওয়া সুতোর মাথা খুঁজে ধরে আবার জোড়া লাগানো-এ যেন শুধু কাজ নয়, এক ধরনের শিল্প । ধুলা, গরম, শব্দের ভেতরেও তাদের মনোযোগ অসাধারণ। বিশ্বের বড় ব্র্যান্ড যখন বাংলাদেশের পোশাক নিয়ে গর্ব করে, তখন সেই গর্বের পেছনে থাকে এই শ্রমিকদের ঘাম, রক্ত, অনিদ্রা, আর আত্মত্যাগ । কাঁচা সুতোকে যত্নে টেনে, বারবার ভেঙে যাওয়া সুতো জোড়া লাগিয়ে, গরম ধুলোভরা পরিবেশেও মনোযোগ ধরে রেখে তারা প্রতিটি ইঞ্চি কাপড়ে যোগ করেন নিজের দক্ষতা ও নিষ্ঠার চিহ্ন । বিশ্ব যখন প্রস্তুত পোশাক দেখে মুগ্ধ হয়, তখন সেই পোশাকের পেছনে থাকা হাতগুলোর গল্প অনেক সময়ই অদেখা রয়ে যায় । অথচ তাদের শ্রমই বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করেছে ।

মুক্তিযুদ্ধ ও টেক্সটাইল: স্বাধীনতার বুননে এক গৌরবগাথা

(রায়হান আহমেদ, ব্যাচ ৯, DTE)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তির এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ বাঙালি জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এই বৈষম্যের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল পাট ও টেক্সটাইল শিল্প, যা তখনকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল উৎপাদন সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল, যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। পাট, সুতা ও অন্যান্য টেক্সটাইলজাত পণ্য রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো, তার সিংহভাগ ব্যবহৃত হতো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণে। পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক টেক্সটাইল মিল, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছিল সুস্পষ্ট অবহেলা। এর ফলে এখানকার জনগণ শিল্পভিত্তিক কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এই অর্থনৈতিক বঞ্চনা শুধু আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি করেনি, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষকেও গভীর করেছে। টেক্সটাইল খাতে বিদ্যমান এই কাঠামোগত বৈষম্য বাঙালিদের মধ্যে আত্মপরিচয় ও ন্যায্য অধিকারের দাবি জোরালো করে তোলে। ফলে অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে টেক্সটাইল শিল্প সরাসরি সামরিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত না থাকলেও এর সামাজিক ও মানবিক ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ নিজেদের হাতে বোনা কাপড়, গামছা, লুঙ্গি ও কম্বল মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সহায়তার জন্য প্রদান করে। শরণার্থী শিবিরে বস্ত্র ছিল খাদ্যের পাশাপাশি একটি অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দেশীয় কাপড়ে তৈরি হওয়ায় টেক্সটাইল শিল্প স্বাধীনতার একটি শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ সময় টেক্সটাইল ও পাট শিল্প পুনর্গঠন জাতীয় অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং উৎপাদন পুনরায় চালুর মাধ্যমে পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। যদিও ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতা ছিল, তবুও এসব উদ্যোগ ভবিষ্যতের শিল্পায়নের ভিত্তি গড়ে তোলে। ১৯৮০-এর দশক থেকে তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, তুলনামূলক স্বল্প শ্রম ব্যয় এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা স্পিনিং, উইভিং ও ওয়েট প্রসেসিং খাত বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পকে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে। বর্তমানে এই শিল্প দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আত্মনির্ভরতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একই সঙ্গে দেশীয় কাঁচামাল ও ফ্যাব্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে।
তবে পরিবেশ দূষণ, শ্রমিক নিরাপত্তা, টেকসই উৎপাদন পদ্ধতির অভাব এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সীমাবদ্ধতা এখনো এই শিল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হলে এসব সমস্যার টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান জরুরি।
সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও টেক্সটাইল শিল্প একটি অভিন্ন ইতিহাস ও উদ্দেশ্যে আবদ্ধ। টেক্সটাইল খাতে বিদ্যমান বৈষম্য যেমন মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি স্বাধীনতার পর এই শিল্পই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতেও টেকসই শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে টেক্সটাইল খাত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

শেষ ট্রেন

(মো. আব্দুল কাইয়ুম, ব্যাচ ১১, DTE)

স্টেশনে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনো আলো নেই, শুধু স্টেশনের পুরনো ঘড়ির কাঁটা চলার একটানা শব্দ-টিক... টিক... টিক...। রাত ১১:৪৭। এই সময়ে কোনো ট্রেন থাকার কথা নয়। নির্জনতা চিরে হঠাৎ কানে এলো লোহার চাকার এক কর্কশ আর্তনাদ। কুয়াশা ফুঁড়ে ধীরগতিতে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত যান। ট্রেনটার গায়ে কোনো রং নেই, নেই কোনো নাম কিংবা পরিচয়বাহী নম্বর। কামরার জানালাগুলো জমাট কালো কাঁচের ভেতরটা যেন এক অতল গহ্বর।
মনের ভেতর থেকে কেউ যেন ফিসফিস করে বলল, "এই ট্রেনে না উঠলে জীবনের কোনো সত্যই আর জানতে পারবে না।" ভেতরে পা রাখতেই একটা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। কামরার যাত্রীরা সবাই পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। প্রত্যেকের চোখ খোলা, কিন্তু সেই চোখে কোনো দৃষ্টি নেই- যেন প্রাণহীন কাঁচের গোলক। হঠাৎ অন্ধকার কোণ থেকে একজন ফিসফিস করে বলে উঠল, "এখানে তারা বসে আছে, যারা সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছিল।" ট্রেন চলতে শুরু করল। কোনো ঝাঁকুনি নেই, শুধু এক অদ্ভুত শূন্যতায় ভেসে চলা।

প্রথম স্টেশন- প্ল্যাটফর্মের সাইনবোর্ডটি ধোঁয়াশাটে। হঠাৎ ঘোষণা শোনা গেল: "এখানে তারা নামে যারা আজীবন গোপন করেছিল।" একজন যাত্রী উঠে ধীর পায়ে নেমে গেল। নামার মুহূর্তে সে একবার আমার দিকে তাকাল। সেই চোখে ভয় ছিল না, ছিল এক অনন্ত হাহাকার আর শূন্যতা।

দ্বিতীয় স্টেশন- ঘোষণা এলো: "এখানে তাদের গন্তব্য, যারা লড়বার সাহস হারিয়েছিল।" এবার কেউ নামল না। সবাই মাথা নিচু করে বসে রইল। বোধহয় তারা জানত, এই ধূসর স্টেশনে একবার নামলে আর ফেরার পথ নেই।

শেষ স্টেশন- হঠাৎ কোনো শব্দ ছাড়াই ট্রেনটি থেমে গেল। বাইরে শুধু ঘন কুয়াশা। কুয়াশার চাদর ভেদ করে এগোতেই সামনে পড়ল এক বিশাল আয়না। আমি নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালাম। আয়নায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা দেখতে আমার মতোই, কিন্তু তার দু-চোখে কোনো জ্যোতি নেই। সে এমন এক সত্তা, যে নিজের জীবনের রাশ অন্য কারো হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।
আয়নার ভেতরের 'আমি' ঠোঁট নাড়িয়ে বলে উঠল, "আজও যদি তুমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে না নাও, তবে পরের স্টেশনটি হবে তোমার চিরস্থায়ী ঠিকানা।" পেছনে তাকাতেই দেখি ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক তীব্র আতঙ্ক আমায় গ্রাস করল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।
হঠাৎ- আমি বিছানায় ধড়ফড় করে বসে পড়লাম। সারা শরীর ঘামে ভেজা, হাত কাঁপছে। সব কি তবে দুঃস্বপ্ন?

বুক ভরে শ্বাস নিলাম। কিন্তু অভ্যাসবশত পকেটে হাত দিতেই শরীর হিম হয়ে গেল। আঙুলের ডগায় উঠে এলো এক টুকরো শক্ত কাগজ- একটি পুরনো ট্রেনের টিকিট। উল্টে দেখি তাতে লেখা: "পরের বার এটি আর স্বপ্ন হবে না।" ঘড়ির দিকে তাকালাম। সময় ঠিক ১১:৪৭। বাইরের নির্জন রাত চিরে বহু দূর থেকে ভেসে এলো একটি ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসেল।

জামদানি শাড়ির ইতিহাস ও ঐতিহ্য

(মো. মাহাদি হাসান, ব্যাচ ১১, DTE)

জামদানি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন এবং আভিজাত্যপূর্ণ কুটিরশিল্প। এটি মূলত মসলিনের একটি আধুনিক সংস্করণ। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) জামদানি বুনন শিল্পকে 'নিরাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' (Intangible Cultural Heritage of Humanity) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১৬ সালে জামদানি বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

যেভাবে বিকাশ
জামদানির ইতিহাস শত বছরের পুরনো।
মুঘল আমলে জামদানি শিল্পের স্বর্ণযুগ ছিল।
ঢাকার অদূরে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরের আবহাওয়া এবং আর্দ্রতা জামদানি বুননের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
মূলত ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ ও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় এই শিল্পের বিকাশ ঘটে।
মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্প এক সময় বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করে।
ইতিহাসবিদদের মতে, জামদানি শব্দটি ফারসি শব্দ 'জামা' (কাপড়) এবং 'দানা' (বুটি) থেকে এসেছে।

কারুকাজ ও বুনন শৈলী
জামদানি বুনন পদ্ধতি বিশ্বের অন্যান্য বস্ত্রশিল্প থেকে আলাদা। এতে কোনো মেশিনের সাহায্য ছাড়াই হাতে বাঁশের মাকুর সাহায্যে কাপড়ের ওপর নকশা করা হয়। জামদানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-বুননের সময় কাপড়ের উল্টো পিঠে কোনো সুতো বাড়তি থাকে না। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
নকশার ধরন: পান্না হাজারী, দুবলি জাল, তেরছা, জলপাড় ইত্যাদি বাহারি নকশা।

বুনন: বুননের সময় কারিগররা কোনো আঁকা নকশা দেখে নয়, বরং স্মৃতি থেকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে নকশা ফুটিয়ে তোলেন।

জামদানির প্রকারভেদ
সুতার মান ও বুননের ওপর ভিত্তি করে জামদানি কয়েক প্রকারের হতে পারে। আগেকার দিনে খুব মিহি মসলিন সুতা ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে সাধারণ সুতা, হাফ-সিল্ক এবং ফুল-সিল্ক জামদানি পাওয়া যায়। বুননের ঘনত্ব এবং সুতার সূক্ষ্মতা অনুযায়ী একে হাফ সিল্ক জামদানি বা কটন জামদানি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।

জিআই স্বীকৃতি ও বর্তমান অবস্থা
২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর জামদানি বাংলাদেশের প্রথম পণ্য হিসেবে GI সনদ লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা জামদানি পল্লী স্থাপন ও কারিগরদের মানোন্নয়নে কাজ করছে। জামদানি শুধু একটি কাপড় নয়, এটি বাঙালির গর্ব এবং আভিজাত্যের প্রতীক। সোনারগাঁর জামদানি হাট আজও এই ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে।

তাঁত থেকে আধুনিক মিল: বাংলাদেশের বস্ত্রের গল্প

(মোঃ জুবায়ের রহমান সাকিব, ব্যাচ ১২, DTE)

বাংলাদেশ আর বস্ত্র এক দীর্ঘ ইতিহাসের অংশ। দক্ষ হাতের বোনা সূক্ষ্ম মসলিন থেকে আজকের আধুনিক মিলের শব্দ—প্রতিটি সুতো বহন করে মানুষ, সংস্কৃতি আর গৌরবের গল্প। সোনালি যুগে বাংলার মসলিন এত সূক্ষ্ম ছিল যে এক গজ কাপড় আংটির ভেতর দিয়ে চলে যেত। জামদানি ছিল শিল্প, ধৈর্য আর গভীর দক্ষতার প্রতীক। এসব কাপড় দূরদেশে পৌঁছে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছিল।ব্রিটিশরা স্থানীয় কারিগরদের দমন করে, দক্ষ তাঁতিদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে, মেশিনে তৈরি কাপড় এনে হাতের বোনা শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। স্বাধীনতার পর শুরু হয় নতুন পথচলা। ধীরে ধীরে হ্যান্ডলুমের জায়গায় গড়ে ওঠে কারখানা আর রপ্তানি শিল্প। আজ ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব পোশাক শক্তি।

মসলিন: গৌরবের কাপড় ঢাকার মসলিন ছিল এক কিংবদন্তি, স্বচ্ছ আর নরম কাপড় যা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল। রাজা, রানি আর ব্যবসায়ীরা এর কোমলতা আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন। শত শত বছর আগে এটি বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরেছিল। অনেকে মনে করেন নামটি ইরাকের মসুল শহর থেকে এসেছে, কিন্তু আসল মসলিন তৈরি হতো ঢাকার বিশেষ সূক্ষ্ম তুলা দিয়ে। বিশেষ করে বাসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরা এতে পারদর্শী ছিলেন। প্রতিটি সুতো ছিল সৃজনশীলতা আর কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন। মুঘল আমলে এটি সম্রাটদের প্রিয় পোশাক ছিল। ১৮৫১ সালের লন্ডন প্রদর্শনীতেও এটি বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়। মসলিন শুধু কাপড় ছিল না, এটি ছিল এক শিল্প, বাংলার সোনালি যুগের উজ্জ্বল প্রতীক।

জামদানি: টিকে থাকা সুতোজামদানি শুধু কাপড় নয়। এটি ইতিহাসের নীরব কণ্ঠ, যা সুতোর ভাঁজে বোনা। কিংবদন্তি ঢাকাই মসলিন থেকেই এর জন্ম। “জামদানি” শব্দের অর্থ ফুলের কলস। এর প্রতিটি নকশা হাতে বোনা, ছাপা নয়। মুঘল যুগে এটি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। সম্রাটরা এর সূক্ষ্মতা আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন। তবে এর সবচেয়ে বড় গল্প টিকে থাকার গল্প। উপনিবেশিক সময়ে যখন এই ঐতিহ্য ধ্বংসের মুখে পড়ে, তখন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁতিরা এর প্রাণ বাঁচিয়ে রাখেন। রাজকীয় জামদানির আগের মান আজ আর নেই, কিন্তু এর আত্মা আজও বেঁচে আছে। প্রতিটি জামদানি আজও ঐতিহ্য আর শক্তির জীবন্ত প্রমাণ।

তাঁতে উপনিবেশের অন্ধকার: ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারা একপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করে, যা শুধু ব্রিটেনের লাভের জন্য ছিল। তাঁতিদের বাধ্য করা হতো কম দামে শুধু কোম্পানির কাছে কাপড় বিক্রি করতে। স্বাধীনভাবে ব্যবসা বা কাঁচামাল কেনা নিষিদ্ধ ছিল। ভারতীয় কাপড়ের ওপর ব্রিটেনে ৭০–৮০% পর্যন্ত কর বসানো হয়, আর ব্রিটিশ মেশিনে তৈরি কাপড় প্রায় শূন্য শুল্কে বাংলায় ঢুকত। এতে দেশীয় শিল্প ভেঙে পড়ে। অনেক দক্ষ কারিগর নির্যাতনের শিকার হন। কেউ কেউ বিকলাঙ্গ হন, কেউ প্রাণ হারান। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্ম বুনন শেখার সুযোগ পায়নি।
যার ফলে বাংলাদেশের হস্তশিল্প ও স্থানীয় বুনন শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাংলা কেবল কাঁচা তুলার সরবরাহকারী হয়ে যায়। এই পরিকল্পিত শিল্প ধ্বংসের ফলে বেকারত্ব, দারিদ্র্য আর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্ববিখ্যাত মসলিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ছাই থেকে জাগরণ: আধুনিক মিলের পেছনের মানুষ স্বাধীনতার পর মেজর জিয়াউর রহমানের রপ্তানিমুখী পরিকল্পনায় বস্ত্রশিল্প নতুনভাবে গড়ে ওঠে। দেশে ছড়িয়ে পড়ে আধুনিক মিল। ঐতিহ্য আর প্রযুক্তির মিলনে শুরু হয় নতুন যুগ। বর্তমানে এই খাতে ৮০% শ্রমিক নারী, যার ফলে নারীরা সাবলম্বী ও সক্ষম হয়েছে। এই খাত দেশের মোট জিডিপির ১৩%, শিল্পমূল্যের ৪০% এবং রপ্তানি আয়ের ৮১% অবদান রাখছে। এছাড়াও ব্যাংক, বীমা, জাহাজ পরিবহন আর পরিবহন খাতও এই শিল্পের

ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। রেডিমেড গার্মেন্টসে বাংলাদেশ এখন চীনের পর দ্বিতীয়। প্রতিটি মেশিনের পেছনে হাজারো শ্রমিকের পরিশ্রম লুকিয়ে আছে, যারা দিনরাত শ্রম দিয়ে উৎপাদন চালিয়ে যায়। তাদের দক্ষতা ও নিষ্ঠা এই শিল্পকে বিশ্বমানের করেছে।

ভবিষ্যতের বুনন: আজ বাংলাদেশ ঐতিহ্য আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এগিয়ে চলছে। পরিবেশবান্ধব কাপড়, নতুন ডিজাইন আর বৈশ্বিক চাহিদা শিল্পকে এগিয়ে নিচ্ছে। বুনন এখন শুধু পেশা নয়, এটি গর্বের প্রতীক। তাঁত আর মেশিন পাশাপাশি কাজ করছে দক্ষ মানুষের হাতে। ঐতিহ্য আর নতুন ভাবনা মিলেই তৈরি হচ্ছে আধুনিক বস্ত্র। এই ভারসাম্য বাংলাদেশকে অন্যতম শীর্ষ বস্ত্র দেশ হিসেবে ধরে রাখছে। প্রতিটি কাপড়ে আছে ইতিহাস, পরিশ্রম আর অগ্রগতির গল্প।নতুন প্রজন্ম প্রযুক্তি শিখে স্বপ্ন বুনছে।স্মার্ট কারখানা আর সবুজ শক্তি বদলে দিচ্ছে উৎপাদনের ধারা।গ্রামের তাঁত থেকে বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছাচ্ছে বাংলাদেশের নাম।প্রতিটি সূতায় জেগে থাকে আগামী দিনের সাহস আর সম্ভাবনা।

উপসংহার : বাংলাদেশের বস্ত্র ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও গৌরবময়। মসলিন আর জামদানি একসময় বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ছিল। ব্রিটিশ শাসনে মসলিন ধ্বংস হলেও জামদানি টিকে আছে, যা আমাদের কারিগরদের দক্ষতা আর শক্তির প্রমাণ।আজ বাংলাদেশ প্রযুক্তি আর হাতের বুননের সমন্বয়ে বিশ্ব বস্ত্রশিল্পে শীর্ষে দাঁড়িয়ে। এই শিল্প আমাদের সংস্কৃতি, ভালোবাসা আর গর্ব বহন করে। প্রতিটি সুতো আর প্রতিটি কাপড় বলে যায় এক জাতির সংগ্রাম আর এগিয়ে চলার গল্প। নতুন প্রজন্ম এই ঐতিহ্যকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। সবুজ প্রযুক্তি আর নতুন ভাবনা যোগ করছে নতুন গতি। এই বুনন থামবে না, কারণ এটি আমাদের পরিচয়।

Female Textile Students

Confidences vs Challenges

(ফারজানা ইসলাম রিতি, ব্যাচ ৯, DTE)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সিদ্ধান্তটা আমার জন্য শুধু একটি একাডেমিক পছন্দ ছিল না; এটি ছিল নিজের আগ্রহ, সাহস এবং সমাজের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটি নীরব ঘোষণা। অনেকের কাছেই টেক্সটাইল মানে ভারী মেশিন, ফ্যাক্টরির শব্দ, দীর্ঘ সময় কাজ—আর এই জায়গায় একজন নারীকে কল্পনা করতেই তারা দ্বিধায় পড়ে যায়। কিন্তু একজন নারী টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে আমি খুব কাছ থেকে বুঝেছি, এই পথ যতটা কঠিন, ততটাই সম্ভাবনাময়।

এই যাত্রার শুরুতেই যে চ্যালেঞ্জটির মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো সামাজিক মানসিকতা। “এটা তো ছেলেদের সাবজেক্ট”, “ফ্যাক্টরিতে কাজ করা কি মেয়েদের জন্য নিরাপদ?”, “নাইট শিফট তো সম্ভব না”—এমন মন্তব্যগুলো অনেক সময় সরাসরি না বললেও ইঙ্গিতে আমাদের কানে আসে। এগুলো শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আমাদের আত্মবিশ্বাসকে নীরবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

একজন নারী টেক্সটাইল শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ শুধু সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, একাডেমিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। টেক্সটাইল এমন একটি বিষয় যেখানে থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল সমান গুরুত্ব বহন করে। ল্যাব ক্লাস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, গ্রুপ প্রেজেন্টেশন—সবখানেই নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, নেতৃত্বের জায়গাগুলোতে নারীদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। তখন বোঝা যায়, শুধু ভালো ফল করলেই যথেষ্ট নয়; আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের অবস্থান তুলে ধরাও জরুরি।

এই চাপের মধ্যেই তৈরি হয় মানসিক লড়াই। পরিবার, পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার—সবকিছু সামলে সামনে এগোনো সহজ নয়। কখনো কখনো নিজের মধ্যেই প্রশ্ন জাগে, “আমি কি পারব?” কিন্তু এই প্রশ্নটাই আবার আমাদের আরও শক্ত করে তোলে। কারণ প্রতিবার সন্দেহের মুখোমুখি হয়ে আমরা একটু একটু করে নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখতে শিখি।

এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় আত্মবিশ্বাস। নারী টেক্সটাইল শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে

শেখে। আমরা শিখি কিভাবে সময় ব্যবস্থাপনা করতে হয়, কিভাবে চাপের মধ্যেও শান্ত থাকতে হয় এবং কিভাবে একটি টিমের সাথে কাজ করে ফল বের করে আনতে হয়। টেক্সটাইল আমাদের শুধু প্রযুক্তি শেখায় না, এটি আমাদের দায়িত্ববোধ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও তৈরি করে।
বর্তমান টেক্সটাইল ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে টেকসই উৎপাদন, এথিক্যাল প্র্যাকটিস এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই জায়গাগুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি একটি বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে। আমরা শুধু নির্দেশ পালনকারী নই, বরং উন্নতির সম্ভাবনা খোঁজা মানুষ।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, প্রতিটি প্রেজেন্টেশন, প্রতিটি ল্যাব রিপোর্ট, প্রতিটি কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার পর আত্মবিশ্বাস একটু একটু করে বেড়ে যায়। আত্মবিশ্বাস আমাদের কাছে কোনো সহজ উপহার নয়; এটি অর্জিত। এটি আসে পরিশ্রম, ব্যর্থতা আর নতুন করে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে।

একজন নারী টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে আমি বুঝেছি, ফ্যাক্টরি শুধু মেশিন আর শব্দের জায়গা নয়। এটি নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্র। এখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নয়, দক্ষতাই আসল পরিচয় হওয়া উচিত। আমরা যখন এই বাস্তবতাকে বুঝে সামনে এগিয়ে যাই, তখন সমাজের অনেক প্রশ্ন আপনাআপনিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

আজকের নারী টেক্সটাইল শিক্ষার্থীরা আর পেছনে দাঁড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে না। তারা প্রশ্ন করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে। চ্যালেঞ্জ আমাদের পথ আটকাতে পারেনি; বরং আমাদের আরও দৃঢ় করেছে।

কারণ আমরা শুধু টেক্সটাইল পড়ি না—
আমরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জের বিপরীতে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলি, আর নিজেদের জায়গা নিজেরাই তৈরি করি।

Textile Engineering:
The Backbone of Bangladesh Economy

(মো. ওমর ফারুক, ব্যাচ ১২, DTE)

Bangladesh's economic growth story is inseparably connected with the development of textile engineering. Over the past few decades, the textile and ready-made garments (RMG) sector has transformed the country from an agrarian economy into one of the world's leading apparel exporters. Today, textile engineering stands as a vital pillar supporting national income, employment generation, and global recognition.

The RMG sector is the largest contributor to Bangladesh's export earnings, accounting for more than 80 percent of total exports. Every year, billions of dollars flow into the economy through garments produced in Bangladeshi factories and supplied to renowned international brands. Behind this massive success lies the contribution of textile engineers who ensure efficient production, quality assurance, cost control, and compliance with global standards. Their technical expertise allows Bangladesh to compete with other textile-producing nations in the global market.

Employment generation is another crucial contribution of the textile industry to the national economy. The sector directly employs over four million workers, a large portion of whom are women. This has played a significant role in women's empowerment, poverty reduction, and social development. In addition, millions of people depend indirectly on this industry through spinning mills, dyeing factories, accessories manufacturing, transportation, packag-

ing, and various support services. Textile engineers help strengthen this employment structure by improving productivity, reducing production losses, and ensuring workplace safety.

Textile engineering covers a wide range of industrial processes, starting from fiber selection to yarn manufacturing, fabric formation, dyeing, printing, finishing, and quality control. Engineers are responsible for selecting suitable raw materials, designing efficient processes, maintaining machinery, and ensuring product consistency. In recent years, the role of textile engineers has expanded further with the introduction of automation, digitalization, and Industry 4.0 technologies. Modern textile factories now rely on advanced machinery, data analysis, and smart systems, all of which require skilled engineers to operate and manage effectively.

Sustainability has become one of the most important concerns in the global textile industry, and Bangladesh has taken remarkable steps in this area. The country is now home to some of the highest numbers of green garment factories in the world. Textile engineers play a leading role in promoting sustainable practices such as water-efficient dyeing methods, waste management, recycling, renewable energy usage, and eco-friendly chemical applications. These initiatives not only protect the environment but also enhance Bangladesh's image as a responsible sourcing destination.

In conclusion, textile engineering is far more than a technical discipline—it is a driving force behind Bangladesh's economic stability and growth. From export earnings and employment to sustainability and global competitiveness, the contribution of textile engineering is undeniable. The dedication of textile engineers and industry professionals continues to weave a stronger, more prosperous future for Bangladesh, making the sector a true backbone of the national economy.

THREAD OF INDEPENDANCE

(শামসুজ্জোহা সিজান, ব্যাচ ১২, DTE)

In the whirring sound of the iron shuttle, I have heard both the cries of freedom and the songs of victory.

When we say "textile," we think of yarn, dyes, fabric, and clothing—
but how much do we truly know about its history, its achievements, its roar? Long before we earned recognition as a nation, this subcontinent was already recognized for its textiles. Where threads weave fabric, and fabric weaves a nation. Wasn't textile the very force that carried our country from the margins to global recognition?
From the ancient Muslin and Jamdani to today's modern fashion—everything is textile.

Is there any greater pride than expressing our country's freedom, history, struggles, and sacrifices through the 10:6 structure of cloth?
When I touch fabric today, it feels as though I am touching freedom itself. I feel it when my fingers glide over a thread— the heartbeat of a nation.
A country that knows how to weave cloth also knows how to weave dreams.Even today, a mother's tears echo through her saree, and a

lungi reminds us of a worker's sweat. One day we may fade away, but the threads of this nation will remain— weaving our dreams long after we are gone.

"Threads whisper silent history, Fabric holds the pain concealed.

In the rhythm of the loom a nation is born, And emotions live in every fold of colour."

আমার ভাবনায় টেক্সটাইল

(এম মারুফ বিল্লাহ, ব্যাচ ১০, DTE)

বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ:
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্প আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এই সেক্টরের গুরুত্ব এতটাই যে, বাংলাদেশের প্রধান আমদানিকৃত পণ্যের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে টেক্সটাইল কাঁচামাল এবং সর্বাধিক রপ্তানিকৃত পণ্য হলো এই সেক্টরে উৎপাদিত তৈরি পোশাক। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে টেক্সটাইল শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।
তবে প্রশ্ন থেকেই যায়-এই সাফল্যের ধারাকে আমরা কতটা টেকসই করতে পেরেছি? বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে, কিংবা একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা এই সেক্টরের জন্য কতটা ভাবছি, কতটা দায় নিচ্ছি? কখনো কি নিজেকে প্রশ্ন করেছি? আমি কী করতে পারি, বা আমার কী করা উচিত? বাস্তবতা হলো, কাঁচামাল নির্ভরতা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, দুর্নীতি এবং গবেষণার অভাব আজও আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে আমার কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোগ নেওয়ার অদম্য ইচ্ছা রয়েছে, যা হয়তো একদিন বড় পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে।
পাট শিল্প: হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের সুযোগ
এক সময় "সোনালি আঁশ" নামে পরিচিত পাট ছিল বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো- এই শিল্পটি আমাদের হাতছাড়া হলো কীভাবে? কেন এবং কোন কোন কারণে পাট শিল্প তার আগের অবস্থান হারালো, সেগুলো বিশ্লেষণ ও উন্মোচন করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমান বিশ্ব যখন পরিবেশবান্ধব ও বায়োডিগ্রেডেবল পণ্যের দিকে ঝুঁকছে, তখন পাট আবারও হতে পারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পাটভিত্তিক শিল্পে নতুন করে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। জুট ডাইভারসিফায়েড প্রোডাক্ট, জুট কম্পোজিট ও আধুনিক জুট টেক্সটাইলের মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাজারে পাটকে নতুন রূপে উপস্থাপন করতে পারি।
কাঁচামাল নির্ভরতা কমানো এবং আত্মনির্ভরতা বাড়ানোর পথ:
বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আমদানিকৃত পণ্য হলো টেক্সটাইল শিল্পের কাঁচামাল। এর ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই নির্ভরতা কমানো এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। আমরা চাইলে আমদানিনির্ভর তুলার পরিবর্তে নিজ দেশেই তুলা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে পারি। বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ি অনেক অঞ্চল এখনো পর্যাপ্তভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। সেখানে আধুনিক ও হাইব্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার করে, জেনেটিক্যালি উন্নত তুলা চাষ সম্ভব। কৃষকদের উৎসাহিত করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তুলা চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে।
একই সঙ্গে গ্রামগঞ্জে উন্নত জাতের ভেড়া ও ছাগল পালন করে মানসম্মত উল উৎপাদনের সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিজ বর্জ্য ব্যবহার করে ম্যান-মেড ও সিন্থেটিক ফাইবার উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এভাবেই বিভিন্ন উৎস থেকে কাঁচামাল উৎপাদনের কৌশল গ্রহণ করে আমরা আত্মনির্ভরতার দিকে এগোতে পারি।
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন:
টেক্সটাইল সেক্টরের একটি বড় দুর্বলতা হলো দুর্নীতি ও অনিয়ম। কাঁচামাল আমদানি, বন্ড সুবিধা, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স থেকে শুরু করে কারখানা অনুমোদন, প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতার অভাব শিল্পের সুস্থ বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম, স্বচ্ছ নীতিমালা, শক্তিশালী অডিট ব্যবস্থা এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে এই দুর্নীতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকার,

শিল্প মালিক এবং ভবিষ্যৎ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মিলিত দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ: উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি টেক্সটাইল যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, তাই এই সেক্টরের জন্য আরও সুসংগঠিত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে টেক্সটাইলের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা যেতে পারে। এই সেক্টরের উন্নয়নে দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীদের সম্পৃক্ত করা, বিসিএস পর্যায়ে আলাদা টেক্সটাইল ক্যাডার বা সেক্টর চালু করা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হতে পারে। টেক্সটাইল শিল্পের জন্য আধুনিক মেশিনারি আমদানি, গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশাসনিকভাবে একটি স্বতন্ত্র কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। একই সঙ্গে সরকারকে এই সেক্টরকে দুর্নীতি ও অনৈতিকতা থেকে দূরে রাখার বিষয়ে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে।

অন্যদিকে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলো গ্রামে গ্রামে গিয়ে টেক্সটাইল শিল্পের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারে। নতুন বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে টেক্সটাইল সেক্টরকে আরও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

একজন টেক্সটাইল শিক্ষার্থী হিসেবে আমার বিশ্বাস, এই সেক্টরের উন্নয়নই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। টেক্সটাইলকে ভালোবাসা, গবেষণায় আগ্রহী হওয়া এবং দেশীয় শিল্পের জন্য কাজ করাই আমাদের মিশন হওয়া উচিত। ইনশাল্লাহ, টেক্সটাইল সেক্টরের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে আরও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছাবে।

আমার ভাবনায় টেক্সটাইল মানেই-একটি আত্মনির্ভর, উদ্ভাবনী ও বিশ্বমানের বাংলাদেশ।

উদ্ভিদবিহীন সেলুলোজ ফাইবারের গল্প!

(মোঃ মাসুদুল ইসলাম আশিক, ব্যাচ ৯, DTE)

ভাবতে অবাক লাগছে তাই না? সেলুলোজ ফাইবার আবার উদ্ভিদবিহীন কীভাবে হয়? তবে আশ্চর্য হলেও সত্যি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার Nanollose Ltd. কোম্পানি তাদের এক উদ্ভাবনী টেক্সটাইল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যার নাম নুলারবার (Nullarbor) ফাইবার এবং এটি সম্পূর্ন উদ্ভিদবিহীন সেলুলোজ ফাইবার যা রেয়ন এর বিকল্প হিসেবে যথোপোযুক্ত।

পরিচিতিঃ

Nullarbor শব্দটি ল্যাটিন "Nullus Arbor" থেকে এসেছে যার বাংলা অর্থ "উদ্ভিদবিহীন"। অর্থাৎ এটি তৈরীতে কোনরকম উদ্ভিদের অংশ ব্যাবহার করা হয় না। এই ফাইবারটি মূলত তৈরী হয় পরিত্যাক্ত নারিকেলে উচ্ছিষ্ট অংশ থেকে। নুলারবার (Nullarbor) ফাইবারকে উদ্ভিদবিহীন রেয়ন ফাইবার ও বলা হয়ে থাকে কেননা এর মধ্য রেয়ন ফাইবার এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং ফাইবারটি রেয়ন ফাইবারের বিকল্প হিসেবে ব্যাবহার করা যাবে।

উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ

সর্বপ্রথম নারিকেলের বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়।

তারপর সেগুলোর মধ্য গাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাইক্রোবিয়াল সেলুলোজ উৎপন্ন করা হয়।

এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে এক মাস কিংবা কিছুটা কম সময় লাগে।

এই প্রক্রিয়ায় খুব অল্প পরিমাণে পানি খরচ হয়।

মাইক্রোবিয়াল সেলুলোজকে পরবর্তীতে ন্যানোল্লোজ টেকনোলজির মাধ্যমে রেয়ন ফাইবারে রূপান্তর করা হয়। ফলে ফাইবারটি উদ্ভিদবিহীন রেয়ন ফাইবার অর্থাৎ নুলারবার (Nullarbor) ফাইবারে রুপান্তরিত হয়।

কেনো ব্যাবহার করবোঃ

রেয়ন ফাইবার আমাদের অতিপরিচিত এক ফাইবার এবং এর ব্যাবহার সমাদৃত। কিন্তু রেয়ন ফাইবার তৈরী করতে প্রচুর পরিমাণ গাছ কাটতে হয়, রেয়ন ফাইবার ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যাবহার করতে হয় যা পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। আবার রেয়ন থেকে তুলা তৈরী করতে প্রচুর পরিমানে পানি লাগে। রেয়ন ফাইবার দিয়ে একটি টিশার্ত তৈরী করতে ২৭০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে নুলারবার ফাইবার তৈরীর জন্য কোনপ্রকার গাছ কাটার প্রয়োজন পড়ে না। গাজন প্রক্রিয়ায় ফাইবার তৈরী করতে হয় যা পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না। এই ফাইবার তৈরীতে পানির ব্যাবহার খুবই সীমিত। এবং কোনপ্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিকের প্রয়োজন পড়ে না। তাই বলা চলে রেয়ন ফাইবারের বিকল্প হিসেবে নুলারবার ফাইবার খুবই টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব।

থ্রিডি গার্মেন্ট সিমুলেশন:
সুঁই-সুতার যুগ থেকে ডিজিটাল বিপ্লবে

(মোঃ সজীব, ব্যাচ ৭, DTE)

১৯৭১ সালে যে দেশটি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছিল, সেই দেশটি আজ বিশ্বের পোশাক শিল্পে দ্বিতীয় স্থানে। প্রতি বছর প্রায় ৪৭ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ এই সংখ্যাটা শুধু একটা পরিসংখ্যান নয়, এটা লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন আর পরিশ্রমের গল্প।
কিন্তু এই গল্পে এখন যুক্ত হচ্ছে এক নতুন অধ্যায় -থ্রিডি গার্মেন্ট সিমুলেশন।

একটি পোশাকের জন্ম আগে এবং এখন -

একটা সময় ছিল যখন একটি পোশাকের ডিজাইন থেকে চূড়ান্ত স্যাম্পল তৈরি হতে লাগত ১৪ থেকে ২১ দিন। প্রতিটি স্যাম্পলে খরচ হত

৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত।
বড় কারখানায় মাসেশত শত স্যাম্পল নষ্ট হত কাপড় নষ্ট, সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট।আজ CLO 3D, Browzwear বা Optitex সফটওয়্যারে একজন ডিজাইনার মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সেই একই পোশাক ভার্চুয়ালি তৈরি করতে পারেন। কাপড়ের ভাঁজ, রঙের বিন্যাস, ফিটিং সবকিছুই মনিটরে জীবন্ত হয়ে ওঠে। গবেষণা বলছে, থ্রিডি সিমুলেশন ব্যবহারে স্যাম্পলিং খরচ ৬০-৭০% এবং সময় ৫০% পর্যন্ত কমে আসে।

বাংলাদেশে কী হচ্ছে?

দেশের বড় গার্মেন্ট গ্রুপগুলো যেমন DBL,Beximco, Square Fashions ইতোমধ্যে থ্রিডি সিমুলেশন প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে। ইউরোপ-আমেরিকার বায়াররা এখন ডিজিটাল স্যাম্পল দেখেই অর্ডার দিচ্ছেন কারখানায় না এসেও। H&M, Zara-র মতো ব্র্যান্ড তাদের সাপ্লায়ারদের থ্রিডি স্যাম্পল পাঠাতে উৎসাহিত করছে।

আমাদের সুযোগ কোথায়?

বিশ্বে CLO 3D দক্ষ প্রফেশনালের চাহিদা প্রতি বছর ৩০% হারে বাড়ছে। একজন দক্ষ থ্রিডি গার্মেন্ট টেকনিশিয়ানের মাসিক বেতন বাংলাদেশেই শুরু হয় ৫০,০০০ টাকা থেকে, আন্তর্জাতিক বাজারে সেটা আরও বহুগুণ বেশি। স্বাধীনতার পর আমাদের বাবা-দাদারা গার্মেন্ট শিল্পকে শূন্য থেকে গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের প্রজন্মের দায়িত্ব সেই শিল্পকে প্রযুক্তির ডানায় আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া।

“সুঁই-সুতার যুগ শেষ হয়নি শুধু সুঁইটা এখন ডিজিটাল হয়েছে।”

(দীপ্তি রানী শীল, ব্যাচ ১২, DTE)

শেখার প্রতিটি মুহূর্ত

(ইয়াসমিন সুলতানা, ব্যাচ ১০, DTE)

অজানা থেকে ধীরে ধীরে ভালো লাগা...

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়ার আগে বিষয়টা নিয়ে আমার ধারণা খুবই সাধারণ ছিল । মনে হতো, টেক্সটাইল মানে শুধু কাপড় বানানো, রং করা আর একটু ডিজাইনের কাজ । এর ভেতরে যে এত বড় একটা জগৎ আছে, এত বিজ্ঞান আর হিসাব লুকিয়ে থাকে-সেটা সত্যি বলতে তখন বুঝিইনি । পরিচিত কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম আমি টেক্সটাইলে পড়ছি । তখন অনেকেই হাসতে হাসতে বলত, "তাহলে কি সেলাই শিখছো?" কথাটা শুনে খারাপ লাগত, কিন্তু রাগও করতে পারতাম না । কারণ তখন নিজের কাছেও পরিষ্কার করে বোঝানোর মতো জ্ঞান ছিল না । ক্যাম্পাস আসার পর ধীরে ধীরে সবকিছু বদলাতে শুরু করল । ক্লাস করলাম, ল্যাবে ঢুকলাম, শিক্ষকদের কথা শুনলাম-তখন বুঝতে পারলাম, টেক্সটাইল আসলে শুধু কাপড় না । এর ভেতরে ফিজিক্স আছে, কেমিস্ট্রি আছে, ম্যাথ আছে, আছে অনেক সূক্ষ্ম হিসাব আর ধৈর্যের কাজ । বাইরে থেকে যত সহজ লাগে, ভেতরে ততটাই গভীর

ল্যাবের ভেতরে শেখা ছোট ছোট সত্য ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, হায়ার ম্যাথ-এসব তো আগেও পড়েছি । কিন্তু টেক্সটাইলে এসে মনে হলো নতুন করে চিনছি । কারণ এখানে শুধু বই না, হাতে-কলমে দেখা যায় । মাইক্রোস্কোপে ফাইবার দেখা, বিভিন্ন ফেব্রিক ছুঁয়ে তাদের পার্থক্য বোঝা-এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই ধীরে ধীরে আমার ভাবনাটা বদলে দিয়েছে । আগে কাপড় মানে শুধু পরার জিনিস মনে হতো, এখন মনে হয় প্রতিটা কাপড়ের পেছনে একটা গল্প আছে ।

অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাবে গিয়ে সবচেয়ে বেশি বুঝেছি ভুলের দাম কত বেশি প্যাটার্নে সামান্য ভুল মানেই পুরো কাজ নষ্ট । তখন মনে হয়েছে-ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে খুব দায়িত্বের জায়গা । এখানে "চলবে" বলে কিছু নেই । ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাবে EPI, PPI, GSM মাপার সময় মনে হয়েছে-একটা কাপড়ও কত আলাদা হতে পারে! বাইরে থেকে একই রকম দেখালেও ভেতরের গঠন আলাদা, শক্তি আলাদা, ব্যবহারও আলাদা । তখন বুঝলাম, কাপড় আসলে একটা বিজ্ঞান ।

ডাইং ল্যাব ছিল সবচেয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা । রঙ ঠিক আসে না, আবার শুরু করতে হয় । কখনো মনে হয়েছে এত কষ্ট কেন করছি । কিন্তু যখন শেষে রঙটা ঠিকমতো আসে, তখন যে শান্তি লাগে-ওই অনুভূতিটা আলাদা । মনে হয়, এই কষ্টটাই দরকার ছিল । টেক্সটাইল আমাকে কী শিখিয়েছে

এখন মনে হয়, টেক্সটাইল আমাকে শুধু একটা সাবজেক্ট শেখায়নি । আমাকে ধৈর্য শিখিয়েছে । ভুল হলে আবার শুরু করতে শিখিয়েছে । অপেক্ষা করতে শিখিয়েছে । আমরা এখনো পুরো ইঞ্জিনিয়ার না-এই কথাটা ভাবলে খারাপ লাগে না । বরং মনে হয়, আমরা এখনো শেখার সময়টার মধ্যেই আছি । এই সময়টাই একদিন সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে । ল্যাবে কাজ করার সময় পানি আর কেমিক্যালের ব্যবহার দেখে মাঝে মাঝে চিন্তা হয় । ভবিষ্যতে কি আমরা আরও ভালো, আরও পরিবেশবান্ধব কিছু করতে পারব না? জানি না আমি কতটুকু পারব, কিন্তু ইচ্ছে আছে-যদি ছোট কিছু পরিবর্তনও আনতে পারি, সেটাই আমার জন্য বড় হবে । আমি শুধু একটা চাকরি করতে চাই-এমন না । আমি চাই, আমার পড়াশোনার একটা মানে থাকুক । আমি যা শিখছি, সেটা যেন কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগে ।

সামনে যাওয়ার ছোট সাহস

কখনো মনে হয়, আমরা এখনো কাঁচা সুতোর মতো । খুব শক্ত না, সহজেই জড়িয়ে যাই, কখনো ভেঙেও যাই । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সুতাই তো শক্ত হয়ে কাপড় হয় । হয়তো আমাদের জীবনটাও তেমন । আজ যেটা কঠিন লাগছে, একদিন সেটাই সহজ মনে হবে । আজ যেটা বুঝি না, একদিন সেটাই অন্য কাউকে বুঝিয়ে বলব ।এই ছোট ছোট ভাবনাগুলোই আমাকে সামনে এগোতে সাহস দেয় । খুব বড় স্বপ্ন না-শুধু ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা । হয়তো একদিন পেছনে তাকিয়ে মনে হবে-শুরুটা সত্যিই খুব সাধারণ ছিল, কিন্তু পথটা সুন্দর ছিল ।

চিঠি

(মুয়াররিফ বিল্লাহ, ব্যাচ ১, Law)

বেলা ৯ টা ১৫.... কুয়াশায় ঢাকা এই শীতল সকালে গায়ে একখানা চাদর নিয়েই রাস্তায় বের হয়ে এসেছেন সামিরা। সামিরা ছুটে চলছেন কতকটা উদ্বাস্তু গৃহহীনের ন্যায়। কতকটা পায়ে হেঁটে, কতকটা দৌড়ানোর মতো করে আর এখন রিকশায় বসে আছেন। দামি গাড়ি ছেড়ে রিক্সায় চড়েন না কখনো, আজ রিক্সায় চড়তে তার খারাপ লাগছে না। রিক্সা চলছে একটু একটু করে, চলছে এই ঠান্ডা বাতাস ঠেলে গন্তব্যে। রিক্সায় বসা যাত্রীর মন ক্রমশ আরো উদগ্রীব হয়ে উঠছে। তার উদগ্রীবতার গতি, অস্থিরতার গতি কম হলেও পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির থেকেও বেশি। রিক্সা যে গতিতেই ছুটুক, সামিরার মন ছুটে চলছে তারও আগে। আজ ২৮ দিন পর দেখা হবে, কি দীর্ঘ সময়!!, কি দীর্ঘ অপেক্ষা!!

হাতে ২ টা চিঠির খাম। প্রেরকের বন্ধু চিঠিগুলো কাল রাতে দিয়ে গিয়েছে। তিনি চিঠি দুটোতে বার বার হাত বুলাচ্ছেন আর কি একটা শূন্যতা সামিরা তার হাতের স্নেহ দিতে পূরণ করে দিতে চাইছেন। কিন্তু চিঠির মতো জড় বস্তু কি তার স্নেহ গ্রহণ করতে পারবে?? পারবে তার প্রেরককে সেই স্নেহ, ভালোবাসা অদৃশ্যভাবে পৌঁছে দিতে?? রিক্সা চালককে গন্তব্যের নাম বলে সামিরা আর টু শব্দটিও করে নি। এই কোলাহল, এই ব্যস্ত শহরের জটিলতা আজ তার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। শুধু অপেক্ষা, দীর্ঘশ্বাস আর একটা চাপা উত্তেজনা। গুলশানের অলি-গলি ঘুরে রিক্সা ছুটে চলছে বনানীর দিকে। সামিরার কেবলই মনে হচ্ছে তিনি আজ যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন তার সাথে এই শহুরে অলি-গলিতে এভাবে রিক্সায় ঘুরা উচিত ছিলো।

সামিরা হাতে থাকা খাম গুলোর মধ্যে ১ নং লেখা খামটি খুলে চিঠিটা বের করলেন। প্রেরক চেয়েছেন প্রাপক যেনো পরপর চিঠি গুলো পড়েন। সামিরাও তাই করছেন। যদিও এই চিঠিটা উনি গতরাতেও একবার পড়েছেন। তবুও তার অস্থিরতা, পরিচিত হাতের লেখা গুলো দেখবার এক তৃষ্ণা। বার বার দেখেও তিনি তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারছেন না। চিঠিটা তিনি খুললেন প্রেরক খুব বেশি কিছু লিখেন নি এই চিঠিতে, শুধু দেখা করবার আবদার করেছেন। সামিরা তাড়াতাড়ি চিঠিটা তাড়াতাড়ি পড়ার চেষ্টা করছেন কারণ প্রেরকের বলা গন্তব্যে প্রায় চলে এসেছেন। রিক্সা থামার আগে আগে সামিরা আরেকবার পুরো চিঠিটা পড়তে চান। সাদা কাগজে, জেল পেনে লেখা:

" আশা করি ভালো আছো। চিঠিটা যদি রাতে পেয়ে থাকো তাহলে সকালে আমার সাথে দেখা করতে এসো। আমি জানি দিনে তুমি ব্যস্ত থাকো, তাই দিনেই আসতে বললাম। তোমার ব্যস্ত সময়ের একটু আমি পেতে চাই। এই আবদার টা তুমি রাখবে আমি জানি। পরের চিঠিটা এখনই পড়ো না। ওটা আমার সামনে এসে তুমি পড়বে। আমি তোমার অনুভূতি টা দেখতে চাই। দেখা করতে আসার সময় গাড়ি নয়, রিক্সায় এসো। "

চিঠির শেষে ঠিকানাটাও লেখা রয়েছে। রিক্সা চালকের " আপা নামেন " কথায় মুখ তুলে তাকালো সামিরা চিঠির লেখা ঠিকানায় পৌঁছে গেছেন। ঠিকানা - House-02, Road - 27, Banani Graveyard, Dhaka।

ভাড়া চুকিয়ে রাস্তায় নামলেন সামিরা চৌধুরী। ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোচ্ছেন তিনি। এই সামান্য রাস্তা টুকুও তিনি হাঁটতেন না, গাড়ি ছাড়া আসেননি কখনো। অথচ আজ তিনি সেই সব কাজ করছেন যা তিনি কখনো করেন নি। আজ তার কিছু যায় আসছে না, মনে হচ্ছে না এই শহরের বায়ু দূষিত। গেটের কাছে এসে খানিক্ষন দাঁড়ালেন, একটা হাহাকার লাগছে। উনি কি নার্ভাস?? এতো কনফিডেন্স, এতো সফল নারী উদ্দোক্তা, একজন সফল অভিনেত্রীর আজ নার্ভাস লাগছে!!! সামিরার বুক ভার হয়ে আসছে, আর একটু পর তার সাথে দেখা হবে। এই বুক ভার হয়ে আসা টা, চিঠির প্রেরককে এখানে রেখে যাওয়ার সময়ও এতো অনুভব করেননি। আজ ২৮ দিন পর এই ভার হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছেন না।

সরু রাস্তা টা ধরে একটু একটু আগাচ্ছেন আর হাতের চিঠিগুলোকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরছেন বুকের মাঝে। সামিরার হুট করে মনে হলো চিঠির প্রেরক ফুল পছন্দ করে... কিন্তু তিনি এলেন একেবারে খালি হাতে। মনে মনে দুঃখ হলো। সরু রাস্তার শুরুতে একটা অপরাজিতার গাছ থেকে দু'টো ফুল ছিঁড়ে নিলেন। একেবারে খালি

হাত নেই আর... অন্তত দু'টো ফুল তো আছে। অবশেষে সামিরা এসেছেন। অবশেষে তারা মুখোমুখি, অপেক্ষার অবসান। সামিরা তাকিয়ে আছেন, অপলকভাবে। ঘাসে ভরা একটা কবর। পাশে থাকা শিউলি গাছ তার সমস্ত ফুল এই চিঠির প্রেরককে উৎসর্গ করেছে। একটা মিষ্টি সুভাস এখানে। সবুজ ঘাসের চাদর মুড়ি দিয়ে চিঠির প্রেরক সুয়ে আছেন। সামিরা ঘাসে হাত বুলিয়ে ঘাস গুলোতে পড়া শিশির বিন্দু গুলোকে অনুভব করলেন। কি জানি স্পর্শ করলেন, এক শূন্যতার গভীরতা মাপলেন, তিনি কিন্তু পূরণ করতে পারলেন না তার হৃদয়ের হাহাকার।। উঠে দাঁড়ালেন। কাঁপা কাঁপা হাতে ২য় খাম টা খুলতে লাগলেন। একই সাদা কাগজ, একই জেল পেনের কালিতে লেখা এ চিঠিটাও। সামিরা পড়তে লাগলেন।

"মা, এভাবে তাড়াহুড়ো করে আসবে জানতাম, তোমায় এভাবে বিচলিত করবার জন্য I'm Sorry তুমি কেমন আছো? ব্যস্ততা কেমন যাচ্ছে? এতো ব্যস্ততার মাঝে এই যে আমার কাছে এসেছো কেমন লাগছে? আমার তো মজা লাগছে... আমার হাসি পাচ্ছে... যদিও তুমি আমায় দেখছো না তবে আমি হাসছি... আমার হাসি মুখ তোমার মনে আছে?? একবার মনে করো। মনে পড়েছে?? আচ্ছা মা, তুমি আমায় কতটা ভালোবাসো?? অনেকটা?? নাকি একটু? আমি তোমাকে-বাবাকে সবাইকে অনেক ভালোবাসি। অনেক মিস করি। বাবার সাথে দেখা হয় নি ৪ বছর। আমি জানি না আমি চলে আসার সময় উনি এসেছিলো কিনা। আশা করি এসেছিলেন। যদি নাও এসে থাকেন তবুও দুঃখ নেই। মনে হয় ব্যস্ত ছিলেন। আমি এই ব্যস্ততা শব্দটির সাথে অভ্যস্ত। আমার দুঃখ হয় না আর। তুমি তো জন্ম দিয়েছো, তাই চিঠি পেয়ে হয়তো সেই টানে ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে এসেছো। বাবার সাথে তোমার আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আমি আর তোমাদের কখনো একসাথে পাই নি। বহু ঈদ বহু জন্মদিন গিয়েছে আমি অপেক্ষায় করেছি একটা সারপ্রাইজের। কল্পনা করেছি তুমি আর বাবা আমাকে সারপ্রাইজ দিবে সব বিবাদ ভুলে। কিন্তু তা হয় নি।

আমার কিছু অভিযোগ বলবো আজ যেগুলো তোমার সাথে থাকবার সময় বলার সুযোগ পাইনি, তুমিও ব্যস্ততার মাঝে শুনবার আগ্রহ পাও নি। জানো মা, রিমা আন্টিকে আমার মা ডাকতে খুব ইচ্ছে করতো। একটা দীর্ঘ সময় আমি মনে করতাম উনিই আমার মা। একটা শিশুর মায়ের সাথে স্মৃতি থাকে সবচেয়ে বেশি অথচ দেখো আমার সবচেয়ে বেশি স্মৃতি আন্টির সাথে। আন্টি সেই কাজ গুলো করেছেন যা আমি তোমার থেকে পেতে পারতাম। স্কুলে নিয়ে যাওয়া টিফিন টা তোমার হাতে বানানো না হোক, একসাথে বসে খেয়ে স্কুলে তো যেতে পারতাম??? ওয়ানে পড়া একটা বাচ্চা ছুটির পর তার মাকে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখতে পারে না!!! অথচ তুমি কখনো আমার স্কুলে আসো নি। কারণ তুমি ব্যস্ত!!

একটা ঈদে কি বিবাদ ভুলে বাবাকে বলা যেতো না আমার সাথে দেখা করে যেতে?? সন্তানের সাথে পিতামাতার বিচ্ছেদ হয় কখনো?? অথচ দেখো তোমাদের বিচ্ছেদে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি... আমি!!! প্রতি জন্মদিনে তুমি কেক আনাতে ঠিকই, কিন্তু ভেবে দেখো তো আমি কয়টা জন্ম দিনের কেক তোমাকে পাশে রেখে কেটেছি?? আমার ২০ তম জন্মদিনে আমি রাত ২ টা অব্দি অপেক্ষা করেছি তুমি আমাকে উইশ করবে। আমি একটা জন্মদিন তোমার শুভেচ্ছা না পেয়ে কাটিয়েছি। আমার বন্ধুর মাও গোটা সংসার চালান, উনি তো আমার বন্ধুটির খোঁজ রাখেন, স্কুলে আসতেন.. ব্যস্ততারও কি প্রকারভেদ রয়েছে?? তুমি কোন ব্যস্ততার মানুষ... মা?? একজন গৃহকর্মী আমাকে মায়ের মমতা অনুভব করিয়েছেন, তুমি কি মা হিসেবে ব্যর্থ হয়ে গেছো এখানে? আমি জানি না। রিমা আন্টি আমাকে গল্প শোনাতেন, খাইয়ে দিতেন, ঘুম পাড়াতেন, স্কুলে নিয়ে যেতেন.... বিনিময়ে অর্থ পেলেও আমাকে অনুভব করিয়েছেন মায়ের মমতা। তোমার ব্যস্ততাকে আমি কি তবে অর্থ দিয়ে কিনতে পারতাম?? আমি তোমার মতো সফল নই, অর্থ নেই... এক শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর মনে কত প্রশ্ন... উত্তর নেই। আমি জানি আমাকে ভালো রাখবার জন্যই এই ব্যস্ততা, এতো কাজ, এতো ছোটাছুটি কিন্তু দেখো আজ সব ব্যস্ততা কই?? তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো... এই দাঁড়িয়ে থাকবার সময়টুকুও যদি আমাকে আমার ২২ বছরের জীবনে একবার দিতে আমি হয়তো আরো ১ টা বছর বেশি আয়ু পেতাম। মা... জীবনে কিছু মানুষকে ব্যস্ততার উর্ধ্বে রাখতে হয়..... অন্তত নিজের সন্তানকে। অসুখে পড়বার সময় এক রাতে আমার খুব ইচ্ছে করছিলো তোমার সাথে রিক্সায় করে ঘুরতে। ওইদিন মনে হচ্ছিলো তোমার সাথে রিক্সায় ঘুরলেই আমি ভালো হয়ে যাবো। আমি প্রাণ পাবো। তোমাকে বলেওছিলাম রাতে রিক্সায় ঘোরা রিস্কি বলে তুমি গাড়ি বের করেছিলে... আমি পাশে বসে ছিলাম ঠিকই... তবে আমার প্রাণ সুস্থতা অনুভব করেনি। এই রিক্সায় ঘোরাব লোভ টা অপূর্ণ রেখেই আমি এখানে সুয়েছি। ক্ষণজন্মা এই জীবনে আমার সামান্য এই

ইচ্ছে পূরণ হয় নি... রিক্সায় ঘুরতে না চাওয়া তুমি আজ এসেছো রিক্সায়। আচ্ছা বলোতো রিক্সা জার্নিটা কেমন?? খুব খারাপ?? রিক্সায় চড়লে কি ক্লাস চলে যায়?? আজ তুমি পায়ে হেঁটেছো এই শহুরে পিচঢালা রাস্তায়... খুব খারাপ লেগেছে?? লাগে নি.... কারণ আজ তুমি নিজের না নিজের সন্তানের কথা রেখেছো। মানুষ যখন তার প্রিয় কারো জন্য কিছু করে তা খারাপ লাগতেই পারে না। তুমিও আমায় ভালোবাসো তবে সময় থাকতে আমাকে ভালোবাসো তা বুঝো নি... তোমার ৬ ফুটের ২২ বছর বয়সী ছেলেটা তোমার কাছে ২ বছরের বাচ্চার মতো ছিলো.... আদর চাইতো, ভালোবাসা চাইতো... কিন্তু বাধ সাধলো ব্যস্ততা। বাবাকেও চিঠি দিয়েছিলাম, জানি না উনি আসবেন কিনা। বিচ্ছেদ কতটা দূরে সরিয়ে দেয় দুটো মানুষকে.... দুটো মানুষের ভরসায় থাকা মানুষ টাকেও। মা.... আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি... অনেক। তোমাকে ছেড়ে আসার কথা ভাবলেই আমার কান্না আসতো। একা এই সমাজে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকার মতো সাহসী একটা মানুষ তুমি। এমন থেকো। ব্যস্ততার মাঝেই তুমি বাঁচার শক্তি পাও আমি জানি। তুমি ভালো ভাবে বেঁচো মা। আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে এসো, আজ যেভাবে এসেছো!!! তোমাকে একা করে চলে এসেছি, অভিযোগ রেখো না?? তোমার কোলে মাথা রেখে চাঁদ দেখা হলো না, সাগর দেখা হলো না, তোমার আঁচলে আমার হাত মোছা হলো না। এই ছোট্ট ইচ্ছে গুলো অপূর্ণ রেখেই চলে এলাম।
ইতি - তোমার.....”

সামিরা আর চিঠি টা পড়তে পারলেন না। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো, চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না... ঝাপসা চোখে তিনি কবরটার দিকে তাকালেন। ফুলে ঢেকে যাওয়া এই ছোট্ট জায়গায় শুয়ে আছে তার একমাত্র সন্তান। নাম ফলক টার দিকে তাকালেন যাতে লেখা রয়েছে

তরঙ্গ

(রোজা শরিফ শান্ত, ব্যাচ ১২, DTE)

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (ISU) ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। “শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”- এই চিরন্তন সত্যকে ধারণ করে এবং একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর পথচলা শুরু হয়। কেবল ডিগ্রি প্রদান নয়, বরং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা নিশ্চিত করে শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ-এর উদ্যোগে আইএসইউ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আতিউর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মোশাররফ হোসেনের দূরদর্শী চিন্তার ফসল এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত যেমন গার্মেন্টস, টেক্সটাইল এবং আইটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তির অভাব মেটাতে একটি বিশেষায়িত ও মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষাপটেই ইউজিসি-র অনুমোদনে ২০১৮ সাল থেকে এর একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর শিক্ষা কারিকুলাম, যা অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড বা এমআইটির মতো বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর আদলে সাজানো হয়েছে। শুরুর দিকে মহাখালীর প্রাণকেন্দ্রে ক্যাম্পাস স্থাপন করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায়িক এলাকা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে থেকে বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রথম পর্যায়ে বিবিএ, ইংরেজি এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু করা হলেও পরবর্তীতে সিএসই এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম যুক্ত হয়। আইএসইউ-এর অন্যতম মাইলফলক হলো এর “ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ”। এখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের নিজস্ব ফ্যাক্টরিগুলোতে সরাসরি হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পায়। ২০২০ সালের করোনা মহামারীর সময়েও কোনো সেশন জট ছাড়াই অত্যন্ত সফলভাবে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ ও স্কলারশিপের দুয়ার উন্মোচন করা হয়েছে। আইএসইউ-এর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো স্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের মতো স্বনামধন্য

প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে সাশ্রয়ী টিউশন ফি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ এবং রোবটিক্স ও ডেটা সায়েন্সের মতো আধুনিক গবেষণাভিত্তিক বিভাগ খোলার পরিকল্পনা করছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান করে নেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি। এটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং হাজারো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ গড়ার এক নির্ভরযোগ্য ঠিকানা।

WOVEN WITH
HERITAGE
From the threads of our past
to the fabric of our future-
we weave stories of resilience,
creativity, and identity.
This is Bangladesh. This is us.
INTERNATIONAL STANDARD UNIVERSITY
TEXTILE CLUB
ISU TEXTILE CLUB
EST. 2021